ডেটলাইন বাংলাদেশ :
নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান
সিডনি শনবার্গ
মফিদুল হক অনূদিত

সূচিপত্র

মুক্তিযুদ্ধ
ই
আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

ভূমিকা

ব্যক্তিগতভাবে এবং রিপোর্টার হিসেবে ১৯৭১ ছিল আমার জন্য এক উল্লেখযোগ্য বছর। এর আগেও আমি অন্যায় সঙ্ঘটিত হতে দেখেছি, তা নিয়ে লিখেছি, কেননা নির্যাতন-নিপীড়ন তো দুনিয়াজোড়া ছড়ানো রোগবীজ, কিন্তু এমন ব্যাপক আকারে এবং এতো পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার প্রতিপালন আমি কখনো দেখি নি। পাকিস্তানে নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচনে পূর্বাংশের বাঙালিরা অর্জন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু পশ্চিমাংশের পাঞ্জাবিরা—দেশের হর্তাকর্তা হয়ে থাকতে যারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং কাজটি করতো সামরিক সরকারের মাধ্যমে—ঠিক করলো নির্বাচনের এমনি ফলাফল মান্য করা যায় না।

নতুন সংবিধান নিয়ে আলাপ-আলোচনার ভণিতার আড়ালে তারা শাদা পোশাকে সৈন্য পাঠাতে থাকে ঢাকায়। ২৫ মার্চের ভেতর সম্পন্ন হয়েছিল তাদের প্রস্তুতি। রাত নেমে আসার সাথে সাথে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনকামী আন্দোলনের ওপর শুরু হলো আক্রমণ। এটা ছিল পুরোপুরিই পাইকারি হত্যাকাণ্ড। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে মিলিটারি কর্তৃক আটক অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে একাদশতলার জানালা থেকে আমিও দেখি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসা গোলা এবং এর ফলে রাতের আকাশকে আলোকিত-করা আগুনের লেলিহান শিখা। আমাদের নিচের রাস্তায় কিছু ছাত্র মিছিল করে এগিয়ে আসছিল। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছিল; জিপের ওপর বসানো মেশিনগানের গুলি তাঁদের কচুকাটা করে ফেললো।

এভাবেই বয়ে চললো ঘটনা—সেই রাত ও তার পরের প্রায় নয় মাস জুড়ে—হত্যা ও নিষ্ঠুরতার এমন এক খেলা যা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতে ঠেলে পাঠিয়ে দিলো। এর কোনো শেষ ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতীয় বাহিনী ডিসেম্বরে সীমান্ত অতিক্রম করে এবং পাক আর্মির টুঁটি চেপে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল যখন স্বাক্ষরিত হলো জন্ম নিলো এক নতুন দেশ—বাংলাদেশ। দেশটি তখনো অতিশয় দরিদ্র—এক বছর বন্যা ও পরের বছর দুর্ভিক্ষে পীড়িত—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অর্জন করলো স্বাধীনতা। এবং যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছে এই দেশটির মুক্তি, আগামীদিনের কঠিন পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিতি থাকা সত্ত্বেও, নিপীড়নের অবসান দেখতে পাওয়ার আনন্দময়তা চিরদিনের মতো তাঁদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২
নিউইয়র্ক নিউজডে

সিডনি শনবার্গ

অনুবাদকের কথা

১৯৭১ সালে নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এর ৩৭ বছর বয়স্ক তরুণ বৈদেশিক সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গ সংবাদপত্র জগতে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি প্রথমবারের মতো বৈদেশিক দায়িত্ব নিয়ে সবে এসেছেন দিল্লি, তখনই শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি এর নানা দিক নিয়ে একাদিক্রমে রিপোর্ট করেছেন তাঁর পত্রিকায়। তাঁর এই অ্যাসাইনমেন্টে বৈচিত্র্যও ছিল বিস্ময়কর। ২৫ মার্চ তিনি ছিলেন ঢাকায়, গণহত্যা শুরুর পরপরই বহিষ্কৃত হন দেশ থেকে, কিন্তু যেটুকু তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং যেসব খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তাতেই তাঁর কাজ হয়েছিল। ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞের প্রথম যে খবরগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয় তার অন্যতম ছিল শনবার্গ-এর রিপোর্ট। এরপর তিনি বারংবার ঘুরেছেন সীমান্ত এলাকাগুলোতে, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গেরিলা অপারেশনে যেমন শরিক হয়েছেন, তেমনি শরণার্থী শিবিরে মানুষের দুর্গতিও দেখেছেন খুব কাছ থেকে। পাশাপাশি, দিল্লি অবস্থানের সুযোগে ছিল রাজনীতি ও কূটনীতির উচ্চতম মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ফলে যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি তিনি অবলোকন করতে পেরেছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। এ কারণে ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত অভিজাত পত্রিকা ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর শরৎ সংখ্যায় পাকিস্তানের সঙ্কট নিয়ে প্রকাশিত নিবন্ধটি ছিল সিডনি শনবার্গ-এরই লেখা।

তবে এসবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর মানবিকতা। আশ্চর্য দরদ নিয়ে তিনি লিখেছেন 'বার্থ্‌ অব এ নেশন'-এর কাহিনী, বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের জন্মকাহিনী। সশস্ত্র সঙ্ঘাতের মামুলি রিপোর্ট ছাপিয়ে বৈদেশিক সংবাদদাতার এইসব বিবরণী হয়ে উঠেছে মানবিকতায় ভাস্বর জীবনচিত্র।

সিডনি শনবার্গ যে অত্যন্ত বড়মাপের সাংবাদিক ও মানুষ তার প্রমাণ বিশ্ববাসী পেল আরো কিছুকাল পর, ১৯৭৫ সালে খেমার রুজদের হাতে কাম্পুচিয়ার পতনের সময়। রোনাল্ড জোফে পরিচালিত 'দা কিলিং ফিল্ডস্‌' ছবির অস্কার বিজয় সিডনি শনবার্গকেও রাতারাতি বিশ্বজনীন খ্যাতি এনে দিল। কেননা এই সত্য কাহিনীর নায়ক যে সাংবাদিক, তিনিই সিডনি শনবার্গ।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লেখা সিডনি শনবার্গ-এর রিপোর্ট একত্র করে বর্তমানগ্রন্থ নিবেদিত হলো। তাৎক্ষণিক সংবাদ–ভাষ্যের মধ্যে কিভাবে ঐতিহাসিক সত্য ফুটে ওঠে, তার চমকপ্রদ উদাহরণ এইসব রিপোর্ট। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরুর পর সাংবাদিকদের ওপর যুদ্ধকালীন সেন্সরশিপ আরোপিত হয়। ফলে যুদ্ধের আলাদা রিপোর্ট করা কোনো সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৩ জন বৈদেশিক

সংবাদদাতা মিলে সেনাবাহিনী অনুমোদিত যে পুল রিপোর্ট করা হয়েছিল সেটাই ছাপা হয় সমস্ত পত্রিকায়। তবে যুদ্ধকালে সিডনি শনবার্গ দ্রুতহাতে যেসব নোট নিয়েছিলেন নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এ তা প্রকাশিত হয় ২১ ডিসেম্বর। এই নোটসমূহও এখানে পত্রস্থ হলো। বক্ষ্যমাণ সকল রিপোর্টই নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত, কেবল একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ফরেন অ্যাফেয়ার্স পত্রিকায়। নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ-বিবরণী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সময়ে সিডনি শনবার্গ-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ম্যালকম ব্রাউন, ডেভিড লিডম্যান, জেম্‌স্‌ স্টুবা ও ফক্স বাটারফিল্ড। তবে আমরা এখানে কেবল সিডনি শনবার্গ-এর রিপোর্টগুলোই সঙ্কলিত করেছি। তাঁর রিপোটিং-এ যে ধারাবাহিকতা ও বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে সেটা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও অনন্য মান রচনা করেছে। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর ছত্রিশটি রিপোর্ট এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। আর কোনো বিদেশী সংবাদদাতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এতো অধিকসংখ্যক রিপোর্ট করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯২ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশ পাবার কথা ছিল। কিন্তু যেসব রিপোর্ট আমরা সঙ্কলিত করেছিলাম তার তালিকা দেখে সিডনি শনবার্গ আরো বেশ কিছু রিপোর্ট থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য একটি ভূমিকা তিনি তখনই লিখে পাঠান। তাঁর কথার সূত্র ধরে অনুসন্ধান করে আমরা আরো প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক রিপোর্টের খোঁজ পাই। দু-একটি রিপোর্ট, কাছাকাছি সময়ের হওয়াতে যেখানে কিছুটা পুনরাবৃত্তি রয়েছে, বাদে অন্য সকল রিপোর্টই এখানে সঙ্কলিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশকালে অনুবাদক সকৃতজ্ঞচিত্তে সর্বাগ্রে স্মরণ করছেন সিডনি শনবার্গ-এর সহায়তা। তিনি কেবল গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতিই দেন নি, একটি বিশেষ ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন আমাদের জন্য। নিউইয়র্কপ্রবাসী বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হাসান ফেরদৌস সিডনি শনবার্গ-এর সঙ্গে যোগসূত্র রচনার দায়িত্ব পালন করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে প্রীতির যে সম্পর্ক সেখানে এইসব আনুষ্ঠানিকতার কোনো অবকাশ নেই। প্রীতিভাজন প্রবাসী লেখক আলম খোরশেদ নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এর দপ্তর থেকে বেশ কিছু রিপোর্টের ফটোকপি পাঠিয়ে আমাদের বিশেষ সহায়তা করেছেন। ঢাকাস্থ মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের পাঠাগারে সংরক্ষিত মাইক্রোফিল্ম থেকে সিংহভাগ রিপোর্টের কপি তৈরি করার শ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন নবীন গল্পকার হামিদ কায়সার। দুই ভুবনের বাসিন্দা এই দুই তরুণ-বন্ধুর কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। ঢাকাস্থ মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক জনাব শামসুল আলম ও তাঁর সহযোগী জনাব মাহতাবউদ্দিন আহমেদ-এর উদার সহায়তার জন্য তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই চিত্তস্পর্শী ধারাবিবরণী বাঙালির মহান উত্থানের আলোড়নময় দিনগুলোর সঙ্গে আবারও যদি আমাদের একাত্মতাবোধ গড়ে তুলতে কিছুটা সমর্থ হয়, তবেই এই গ্রন্থের প্রকাশ সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

ঢাকা

ডিসেম্বর ১৯৯৪

মফিদুল হক

জীবন-পরিচিতি

সিডনি এইচ. শনবার্গ নিউইয়র্ক নিউজডে পত্রিকার কলাম্‌নলেখক ও সহযোগী সম্পাদক। প্রতি বুধ ও শুক্রবার পত্রিকার ভিউপয়েন্ট বিভাগে প্রকাশিত হয় তাঁর কলাম। নিউজডে-তে যোগ দেওয়ার আগে চার বছর তিনি ছিলেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর কলাম্‌ন লেখক। লিখতেন মূলত নিউইয়র্ক মহানগর নিয়ে। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি পত্রিকায় নিয়মিত 'নিউইয়র্ক' নামে একটি ফিচার লেখা শুরু করেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। এর আগে তিনি ছিলেন নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এর বৈদেশিক সংবাদদাতা। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পত্রিকার মেট্রোপলিটান সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

১৯৭৫ সালে খেমার রুজ অভিযানের ফলে কাম্পুচিয়ার পতন প্রত্যক্ষ করেন মুষ্টিমেয় যে কজন বিদেশী সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৭৬ সালের ৩ মে তিনি পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট মেট্রোপলিটান সম্পাদকের পদ বরণ করেন এবং একই দিনে কাম্পুচিয়ার রিপোর্টিং-এর জন্য লাভ করেন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক পুলিৎজার প্রাইজ।

কাম্পুচিয়ার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং কাম্পুচীয় সহযোগী ও বন্ধু ডিথ প্রান-এর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তিনি লিখেছিলেন মানবিকতায় উজ্জ্বল কাহিনী 'দি ডেথ অ্যান্ড লাইফ অব ডিথ প্রান'। সিডনি শনবার্গ ও ডিথ প্রান-এর ঘটনা নিয়ে পরবর্তীকালে নির্মিত হয় ছবি—'দা কিলিং ফিল্ডস্‌'। অস্কার পুরস্কারে সম্মানিত এই চলচ্চিত্র সিডনি শনবার্গকে সারা বিশ্বে সুপরিচিত করে তোলে। ছবিতে অবশ্য তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা স্যাম ওয়াটারস্টোন কিন্তু সিডনি শনবার্গ মানুষটিকে চিনেছিলেন সবাই, ভালোবাসা পেয়েছিলেন তিনি অগণিতজনের।

১৯৩৪ সালের ১৭ জানুয়ারি সিডনি শনবার্গের জন্ম, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর ক্লিনটন-এ। স্থানীয় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে বৃত্তি নিয়ে তিনি পড়তে যান আমেরিকার সুবিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। হার্ভার্ডে থাকাকালীন নানা ধরনের কাজ করেছেন তিনি—বারটেন্ডার, রেস্টুরেন্ট সেবক, ধোপাখানার সহযোগী, যন্ত্রচালক ইত্যাদি।

১৯৫৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে এক বছর তিনি কাজ করেন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাটেক্স করপোরেশন-এ প্রশাসনিক সহযোগী হিসেবে। ১৯৫৫ সালে বাধ্যতামূলক সেনাবৃত্তি পালনের অংশ হিসেবে জার্মানির ফ্রাংক্‌ফুর্টে তৃতীয় আর্মার্ড ডিভিশনে যোগ দেন এবং ডিভিশনের পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হন। এই চাক্‌রির মেয়াদ-অন্তে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে কপিবয় হিসেবে নিউইয়র্ক টাইমস-এ যোগ দেন এবং দপ্তর-করণিক, সংবাদ-সহযোগীর কাজ এবং বৈদেশিক বিভাগ, ছবি সম্পাদনা ও বিন্যাস বিভাগ হয়ে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

রিপোর্টার হিসেবে প্রথম দিকে কাজ করেন নিউইয়র্ক শহরে, পরে আলবানিতে, সেখানে শেষ দুই বৎসর ব্যুরো চিফ হিসেবে।

এরপর প্রথম বৈদেশিক দায়িত্ব-প্রাপ্ত হন ১৯৭১ সালের শুরুতে, বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে দিল্লিতে আসেন সিডনি শনবার্গ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মুক্তিকামী বাঙালিদের রাজনৈতিক সঙ্ঘাত তখন ক্রমেই তীব্রতা অর্জন করছে। মার্চ মাসে অন্যান্য বিদেশী সংবাদদাতাদের সঙ্গে তিনি অবস্থান করছিলেন ঢাকায়। ২৫ মার্চের সামরিক অভিযান শুরু হলে তিনিও ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর বিরামহীনভাবে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর রিপোর্ট করে গেছেন। বারবার ঘুরেছেন সীমান্ত এলাকায়, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন সময় দেশের ভেতরেও প্রবেশ করেছেন। জুন মাসে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিয়মবিধি শিথিল করে কিছুসংখ্যক বিদেশী সংবাদদাতাকে ঢাকা আসার অনুমতি দিলে সিডনি শনবার্গও সে সুযোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর প্রেরিত রিপোর্ট সামরিক শাসকদের মনোপূত না হওয়ায় আবারও বহিষ্কৃত হন তিনি। ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর অভিযানের সাথী হয়ে তিনি পুনর্বার ঢাকায় আসেন। এই নয় মাস সময় জুড়ে যেসব রিপোর্ট সিডনি শনবার্গ করেছিলেন গোটা দুনিয়ার সামনে তা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বাস্তবতাকে মেলে ধরে। তাঁর মতো করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিষয়ে একাদিক্রমে এতো রিপোর্ট আর কোনো সংবাদদাতা করেন নি।

সিডনি শনবার্গ-এর পরবর্তী পোস্টিং ছিল সিঙ্গাপুরে, সেখানে অবস্থান করে দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা হিসেবে তিনি কাজ করেন।

১৯৮৯ সালে তিনি পুনরায় আসেন কাম্পুচিয়ায়। ১৫ বছর পর তাঁর এই প্রত্যাবর্তনের রিপোর্ট নিউজডে পাবলিশার্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। আরো অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে দু-দফা ওভারসিজ প্রেস ক্লাব অ্যাওয়ার্ড, দুবার জর্জ পোল্ক স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৮৮ সালে তিনি সোসাইটি অব সিলুরিয়ান্স-এর পক্ষ থেকে লাভ করেন ২৫ বৎসরের নিউজ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯১ সালে ভূষিত হন অ্যালফ্রেড কে. লোয়েন্সটাইন অ্যাওয়ার্ড-এ।

সিডনি শনবার্গ-এর রয়েছে দুই কন্যা—জেসিকা ও রেবেকা।

ডেটলাইন : ঢাকা
মার্চ ২৭, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণ-অভিযান, জোর লড়াইয়ের খবর, সৈন্যরা কামান দাগিয়েছে, নাগরিকদের ওপর গুলিবর্ষণ, বিভিন্ন এলাকায় অগ্নিসংযোগ

[শনিবার সকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত ৩৫ জন বিদেশী সংবাদদাতার মধ্যে মি. শনবার্গও ছিলেন। তিনি এই বার্তা পাঠিয়েছেন ভারতের বোম্বে থেকে।]

৭৫ মিলিয়ন মানুষের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে পাকবাহিনী কামান ও ভারি মেশিনগান ব্যবহার করছে।

কোনো সতর্কীকরণ ছাড়াই বৃহস্পতিবার রাতে আক্রমণ শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা, সেনাবাহিনীতে রয়েছে যাদের সংখ্যাধিক্য, প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নেমে আসে বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন শক্ত ঘাঁটি অবরোধের উদ্দেশ্যে।

কত নাগরিক আহত বা নিহত হয়েছে সেটা জানার কোনো উপায় নেই। প্রদেশের বাদবাকি অঞ্চলে কী ঘটছে সে সম্পর্কেও কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ঢাকা আক্রমণের আগে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রথমদিকে গোলাগুলি চলছিল বিক্ষিপ্ত, তবে রাত একটার দিকে তা জোরদার ও বিরামহীন হয়ে ওঠে এবং প্রায় তিনঘণ্টা ধরে এমনি চলে। প্রাণের ভয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আটকে থাকা বিদেশী সংবাদদাতারা কামানের গোলাবর্ষণের আগুন দেখতে পেয়েছেন, শুনেছেন এর শব্দ।

উত্তর ঢাকায় অবস্থিত আমাদের হোটেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বাঙালিদের সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন আধা-সামরিক বাহিনী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর ব্যারাকসহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশাল দহনযজ্ঞ দেখা যাচ্ছিল।

আজ খুব সকালে যখন ৩৫ জন সাংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখনও গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং

ইতস্তত আগুন জ্বলছিল।

'হায় আল্লা, হায় আল্লা', হোটেলের জানালা থেকে এসব দেখে চোখের জল চাপতে চাপতে একজন পাকিস্তানি ছাত্র বলছিল, 'ওদেরকে মেরে ফেলছে। ওদেরকে জবাই করছে।'

ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগ

সামরিক ট্রাকের বহরে কঠোর পাহারায় বিমানবন্দরের দিকে যেতে যেতে সাংবাদিকরা দেখেছিলেন সৈন্যরা গরিব বাঙালিদের আবাস রাস্তার ধারের বস্তিগুলোতে আগুন জ্বালাচ্ছিল। স্ব-শাসন আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে এইসব বস্তিবাসী বাঙালি।

বৃহস্পতিবার রাতে সামরিক অভিযানের শুরু থেকে সৈন্যরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, মেশিনগান ও রিকয়েললেস রাইফেলে প্রথমে দালানকোঠায় গোলাগুলি ছোঁড়ে ও পরে গোটা অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

বিদেশী সাংবাদিকরা সকলেই অবস্থান করছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। কি ঘটছে বোঝার জন্য বাইরে যেতে চাইলে ব্যাপকভাবে মোতায়েন সেনাপ্রহরীরা তাঁদের জোর করে ভেতরে ঠেলে দেয় এবং বলে ভবনের বাইরে পা বাড়াবার চেষ্টা নিলে তাঁদের গুলি করা হবে।

হোটেলের আশপাশে গোলাগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রাত একটার দিকে গোটা শহরেই গুলি বর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

১-২৫ মিনিটে বাইরের মিলিটারি গার্ডদের হুকুমে হোটেলের টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়। একই সময়ে টেলিগ্রাফ টাওয়ারের বাতি নিভে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভারি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে।

বাজার আক্রমণ

রাত ২-১৫ মিনিটে মেশিনগান বসানো একটি জিপগাড়ি হোটেলের সামনে দিয়ে ময়মনসিংহ রোডে ওঠে এবং একটি শপিং সেন্টারের সামনে থেমে দোতলার জানালার দিকে নিশানা করে। এক ডজন সৈন্য পায়ে হেঁটে জিপের পিছু পিছু অবস্থান নেয়। তাদের কারো কারো কাঁধে রকেট জাতীয় অস্ত্র।

দোতলা থেকে হঠাৎ চিৎকার ভেসে আসে, 'বীর বাঙালি এক হও' এবং সৈন্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে ভবন ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। এরপর সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শপিং সেন্টারের পাশের গলিতে ঢোকে এবং পথ-আটকে-রাখা গাড়িগুলো উল্টে ফেলে দেয়। সৈন্যদের হাতের টর্চের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল এইসব দৃশ্য এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের একাদশ-তলা থেকে দর্শনরত সাংবাদিকদের কাছে এসব ছিল এক অবিশ্বাস্য নাটক।

সৈনিকরা যখন গলির ভেতরে গুলি ছুঁড়ছিল তখন প্রায় ২০০ গজ দূর থেকে ১৫-২০

জন বাঙালি তরুণের একটি দল তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তারা সৈন্যদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল, তবে মনে হচ্ছিল তারা নিরস্ত্র, তাদের কারো হাতে কিছু নেই।

জিপের ওপরের মেশিনগানের নিশানা ঘুরে গেল তাদের দিকে এবং শুরু হলো একটানা গুলিবর্ষণ। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যরাও যোগ দিল সাথে। দু'পাশের ছায়াময় অন্ধকারে সটকে পড়লো বাঙালি তরুণেরা। কেউ আহত-নিহত হলো কি-না এখান থেকে ঠাহর করা অসম্ভব।

এরপর সৈন্যরা আবার গলির দিকে দৃষ্টি ফেরালো। একটি গ্যারেজে আগুন লাগিয়ে এগিয়ে গেল। দৃশ্যত তাদের মূল লক্ষ্য, সৈন্যবাহিনীকে কটাক্ষকারী শেখ মুজিবের কড়া সমর্থক ইংরেজি দৈনিক *দি পিপল*-এর দপ্তর ও ছাপাখানা।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভাষা উর্দুতে চিৎকার করে তারা ভেতরের লোকদের আত্মসমর্পণ নচেৎ মৃত্যুবরণ করার হুশিয়ারি জানালো। কোনো জবাব মিললো না, ভেতর থেকে কেউ বেরিয়েও এলো না। এরপর সৈন্যরা ভবনের দিকে তাক করে রকেট ছুঁড়ে মারলো এবং মেশিনগান ও হালকা অস্ত্রের গুলিবর্ষণ শুরু করলো। তারপর তারা প্রেস ও যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করে ভবনে আগুন লাগিয়ে দিলো।

আরো ভেতরে এগিয়ে গলিতে যেসব দোকান ও ঝুপড়ি ছিল তাতে তারা অগ্নিসংযোগ করলো এবং অগ্নিশিখা দ্রুত দোতলা ভবনের মাথা ছাপিয়ে উঠলো।

রাত চারটার অব্যবহিত পর আর্তচিৎকার কিছুটা থিতিয়ে এলো, তবে কামান ও মেশিনগানের গোলাগুলি বর্ষণের বিক্ষিপ্ত আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। অনেক দূর থেকে ছোঁড়া ট্রেসার বুলেট হোটেলের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

৪-৪৫ মিনিটে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেড কোয়ার্টারের দিকে আরেকটি বড় অগ্নিকাণ্ড দেখা গেল।

৫-৪৫-এর দিকে সকালের ধূসর আলোয় ছ'টি চৈনিক টি-৫১ ট্যাঙ্কে সওয়ারি সৈন্যরা ঘর্ঘর করে শহরের দিকে এগিয়ে গেল এবং রাস্তায় টহল শুরু করলো।

গতকাল সারাদিন এবং আজ সকালে সাংবাদিকদের বহিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত থেকে থেকে দহন ও গোলাবর্ষণ চলছিল।

গতকাল সকালে মাথার ওপর হেলিকপ্টার চক্কর দিয়েছে, নিশ্চিতই তদারকির কাজে। গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর ত্রাণকাজের জন্য সৌদি আরব যে চারটি হেলিকপ্টার পাকিস্তানকে দিয়েছিল, এই সামরিক অভিযানে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে

সেনাবাহিনীর দখলকৃত ঢাকা বেতারে সকাল সাতটায় ঘোষণা করা হয় প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন এবং রাত আটটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

সকাল আটটার অল্পকাল পরে আগুপিছু জিপ ও ট্রাকে মোতায়েন সশস্ত্র প্রহরায় একটি

১৯৬১ মডেলের শেভ্রলেট গাড়ি হোটেলের সামনে এসে থামে। এই গাড়িবহর জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তাঁর সঙ্গীদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নেতা জনাব ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জনে শেখ মুজিবের দাবির বিরোধিতা করেছিলেন। সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে, সেনাবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীমহল সমর্থিত বা সৃষ্ট এই বিরোধিতাই সাম্প্রতিক সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। বাঙালিরা যে তাদের বর্তমান দুর্গতির জন্য তাঁকেই মূলত দোষারোপ করে এ সম্পর্কে সচেতন ভুট্টো হোটেলের লবিতে এলেন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রধারী সামরিক ও শাদা পোশাকের প্রহরী বেষ্টিত হয়ে। তাঁকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল এবং সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেন এই বলে, 'আমার মন্তব্য করার কিছু নেই।'

দশটার সময় বেতারে নতুন সামরিক আইন জারির কথা ঘোষিত হলো।

হোটেলে সাংবাদিকরা যতবারই খবরাখবর জানতে চেয়েছেন তাঁদের নিরাশ করা হয়েছে। কূটনীতিক মিশনগুলোতে যোগাযোগ স্থাপনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

একবার তর্ক-বিতর্ককালে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে আসা সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ক্যাপ্টেন। তাঁদেরকে ভেতরে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে প্রত্যাবর্তনরত সাংবাদিকদের উদ্দেশে পেছন থেকে চিৎকার করে বললো, 'তোমাদের কিভাবে সামাল দিতে হয় জানা আছে আমার। আমি যদি নিজের লোকজনদের খুন করতে পারি তবে তোমাদেরও পারবো।'

সঙ্কট নিয়ন্ত্রণে আনার ঘোষণা

কিছুক্ষণ পর সামরিক কর্তৃপক্ষ হোটেলে খবর পাঠালো সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটের মধ্যে হোটেল ছাড়ার জন্য বিদেশী সাংবাদিকদের তৈরি থাকতে হবে। সাংবাদিকরা জিনিসপত্র গুছিয়ে হোটেলের বিল চুকিয়ে সামনে-পিছে পাঁচ ট্রাক বোঝাই সৈন্যের প্রহরায় যখন হোটেল থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বের হলেন, তখন রাত ৮-২০ মিনিট। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ সবে শেষ হয়েছে।

হোটেল ত্যাগের ঠিক আগে একজন সাংবাদিক দায়িত্বপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে জিগ্যেস করেছিলেন বিদেশী সাংবাদিকদের বিদায় দেওয়া হচ্ছে কেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমরা চাই আপনারা চলে যান, কেননা এটা আপনাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সবকিছু হয়ে উঠবে অতিশয় রক্তাক্ত।' হোটেলের কর্মচারী ও অন্যান্য বিদেশী অতিথি যাঁরা হোটেলে রয়েছেন তাঁরা সবাই মনে করেন সাংবাদিকদের বিদায় ঘটলে সূচনা হবে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের।

হোটেলের একজন কর্মী বললেন, 'এটা হোটেল থাকছে না, এটা হয়ে উঠবে রক্তাক্ত হাসপাতাল।' দূরে অব্যাহত গোলাগুলির পটভূমিকায় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের ব্যাগপত্র কঠোরভাবে তল্লাশি করা হলো এবং কিছু টেলিভিশন ফিল্ম, বিশেষভাবে বি বি সি-র তোলা, বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ডেটলাইন : নয়াদিল্লি, ভারত
মার্চ ২৮, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লাঠি ও বর্শা

ঘরে তৈরি বন্দুক, লাঠি ও বল্লমে সজ্জিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যারা বিমান, বোমা, ট্যাঙ্ক ও ভারি কামানে সশস্ত্র।

তিন রাত আগে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সরকারি বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের পর এই প্রতিরোধের শুরু, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য অহিংস প্রয়াস থেকে যার বিকাশ।

গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানিরা এবং এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছে সেনাবাহিনী।

মার্চ মাসের শুরুর দিকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক অবাধ্য নাগরিকজনকে দমাতে পাকবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকদের জানাচ্ছিলেন।

দীর্ঘদেহী এই পাকিস্তানি অফিসার বলেছিলেন, 'যখন ডাকা হবে সেনাবাহিনীকে সেটা হবে একেবারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ। সেনা-বাহিনী হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই গুলি ছুঁড়বে।'

এই বক্তব্য ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। দুই সপ্তাহ পর গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে পাকিস্তান আর্মি বস্তুত ঢাকার রাস্তায় চলাচলকারী অথবা জানালা থেকে জোরগলায় প্রতিবাদ ধ্বনি তোলা যে কাউকে যথেচ্ছভাবে হত্যা করে চলেছে। স্বশাসন প্রতিষ্ঠাকামী বাঙালিদের আন্দোলন ধ্বংস করে দিতে পূর্ব পাকিস্তানি নাগরিকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ব্যবহার করছে কামান, মেশিনগান, রিকয়েললেস রাইফেল ও রকেট।

এটা নিশ্চিত যে, হাজার হাজার বাঙালি মারা পড়বে, তবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জনগণের অঙ্গীকার হচ্ছে গভীর—এতো গভীর যে ১০০০ মাইল দূরের কার্যত-বিদেশী সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখতে পারবে কি-না সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে উঠেছে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে আছে ভারত ভূখণ্ড দ্বারা। এই দুই জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, বাহ্যিক অবয়ব সবই আলাদা। ১৯৪৭ সালে অভিন্ন ইসলাম ধর্মের বিচারে ভারত ভাগ করে দুই অঞ্চলবিশিষ্ট দেশটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে পুবের ওপর পশ্চিমের আধিপত্য চলছে।

সেনাবাহিনী এসেছে পশ্চিম-দেশ থেকে, যেখানে বড় ব্যবসায়ীদের সমাবেশ, মাথাপিছু আয় বেশি, জিনিসপত্রের দাম কম। ৭৫ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানিদের তুলনায় ৫৫ মিলিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানিদের সবকিছু অধিকতর ভালো।

অনেক বাঙালিই, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা এই নামেই পরিচিত, গত কয়েক সপ্তাহে শহর থেকে পালিয়ে দেশের অভ্যন্তরে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। এই সংবাদদাতাসহ সকল বিদেশী সাংবাদিককে শনিবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাদের দেহ ও মালপত্র তল্লাশি করে ফিল্ম ও নোটখাতা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে বিচ্ছিন্ন ও সত্যাসত্য-যাচাই-দুষ্কর যেসব খবর এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে আর্মি তাদের নিপীড়ন জোরদার করছে এবং বাঙালিদের প্রতিরোধও বাড়ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক আয় ও করের বড় অংশ ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রকল্পে ও সেনাবাহিনীর খরচ মেটাতে, জাতীয় বাজেটের ৬০ শতাংশ যাদের জন্য বরাদ্দ। সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা ১০ শতাংশেরও কম। আর্মি তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করেছে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ব্লক ও কমিউনিস্ট চীন থেকে। এ পর্যন্ত কোনো বৃহৎ শক্তিই পূর্ব পাকিস্তানে আর্মির তৎপরতার নিন্দাবাদ করে নি।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক আলোচনায় কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল, এই আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পরপরই ঘটে আকস্মিক সেনা-আক্রমণ। কিন্তু সামান্য যেসব সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় পশ্চিমীরা কখনোই শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে দিতে চায় নি। বাঙালিদের ক্ষোভের প্রতি সহানুভূতিশীল সদাচারী জেনারেল হিসেবে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের ইতিপূর্বেকার ইমেজ হঠাৎই বিপুলভাবে পাল্টে গেছে। তিনি বলেছেন, আলোচনা ভেঙে গেছে, কেননা নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে চুক্তিনামা আলোচনায় শেখ মুজিব অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মুজিব তো জানেন জাতীয় সংসদ অধিবেশন শুরুর আগে একটি লিখিত চুক্তিনামায় তাঁকে উপনীত হতে হবে।

আলোচনা গড়িয়ে চলে ১০ দিন ধরে এবং বাঙালি 'গুজবমহলে' নানা রব ওঠে, বড্ড দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে আলোচনা, কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে যেন।

এই সময় শেখ মুজিব ও তাঁর আওয়ামী লীগ সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করে কার্যত গোটা

দেশবাসীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শেখ মুজিবের অনুগামীরা কতক সরকারি সংস্থা দখল করে নেয়, কতক বন্ধ করে দেয় এবং উপেক্ষা করে বিভিন্ন সরকারি নির্দেশ। যেমন একটিতে বলা হয়েছিল প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত বেসামরিক ব্যক্তিদের অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে হবে, অন্যথায় ১০ বছরের 'সশ্রম কারাদণ্ড' প্রদান করা হবে।

কোনোরকম অর্ধ-স্বায়ত্তশাসন নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলতে শুরু করে জঙ্গি ছাত্র-শ্রমিকরা এবং ওড়ানো হয় বাংলাদেশের সবুজ, লাল ও সোনালি পতাকা।

কিন্তু বাঙালিদের এইসব উদ্দীপ্ত দিনের পরিসমাপ্তি ঘটলো দ্রুতই। আলোচনায় অগ্রগতি মন্থর হয়ে আসার খবরের পাশাপাশি আর্মি ক্র্যাকডাউনের শঙ্কা দেখা দিতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন বিমানযোগে সৈন্য নিয়ে আসা হয় এবং বাঙালিদের অনেকে ভাবতে থাকেন পশ্চিম পাকিস্তানস্থ সরকারকে পূর্বাংশে ব্যাপক সেনা-সমাবেশ ঘটাবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার জন্যই আলোচনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দীর্ঘ করা হচ্ছে।

বেশ কয়টি শহরে বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং হতাহতেরও খবর পাওয়া যায়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার আগে বিলি করা একটি বিবৃতিতে শেখ মুজিব তাঁর ভাষায় 'সন্ত্রাসের রাজত্বের' নিন্দাবাদ করেন। এর প্রায় চার ঘণ্টা পর সৈন্যরা রাস্তায় নেমে এসে গুলি ছুঁড়তে থাকে।

সংগুপ্ত বাংলাদেশ বেতারের দাবি মতো ৫১ বৎসর বয়স্ক শেখ মুজিব জীবিত ও মুক্ত রয়েছেন, নাকি সেনাবাহিনীর দাবি মোতাবেক তিনি বন্দী হয়েছেন, সেটা কেউ নিশ্চিত জানে না। তবে জীবিত বা মৃত যাই হোন না কেন, তিনি হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরোধের প্রতীক।

পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ অভিযানের অসমর্থিত খবর ছাড়াও প্রতিরোধের কিছু স্পষ্টতর নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

শুক্রবার সকালে নতুন ১৫টি কঠোর বিধি ঘোষণা করা হয়েছে। এর একটির লক্ষ্য নিশ্চিতভাবেই অসহযোগ আন্দোলন। সকল সরকারি কর্মচারীকে শনিবার সকাল দশটার মধ্যে কর্মস্থলে হাজির হতে বলা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫ হাজার বর্গমাইলের খুব কম এলাকারই জরিপ বা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা না জানে এখানকার ভাষা, না বোঝে নদীর স্রোতের গতি। তাদের জীবন দুঃসহ করে তুলতে পারে গেরিলা বাহিনী। এমন কতক নদী রয়েছে বর্ষা মৌসুমে প্রায়শ যাদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। একটি ফেরি ধ্বংস করতে পারলে আটকে রাখা যায় এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য।

পাকিস্তানের যদি পর্যাপ্ত বোমা থাকে এবং বিমান হামলার পরিকল্পনা তারা নেয় তাহলেও বোমাবর্ষণে খুব কাজ হবে না। জনসংখ্যা খুব ছড়ানো, প্রায়শ ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত অঙ্গনে তাদের বসবাস। শহরে বা গ্রামে একত্র সমাবেশ নয়। ভালো রাস্তা বিশেষ নেই। রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনও খুব সীমিত। কতক অঞ্চলে এসবের অস্তিত্বই নেই।

বঙ্গোপসাগরের তীরে চট্টগ্রাম হচ্ছে একমাত্র বন্দর যেখানে সৈন্য ও সরবরাহ বোঝাই বড় জাহাজ ভিড়তে পারে। ঢাকার সঙ্গে সড়ক, রেল ও ফেরিযোগে চট্টগ্রামের যে যোগাযোগ তা সহজেই বিপর্যস্ত হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। কোনো কোনো কূটনৈতিক মহলের হিসেবে সঙ্কট শুরুর আগে এই সংখ্যা ছিল ২৫,০০০। এরপর থেকে সৈন্য-বোঝাই কয়েকটি জাহাজ করাচি বন্দর ছেড়েছে এবং এক রিপোর্টে প্রকাশ, এদের কোনো কোনোটি চট্টগ্রাম পৌঁছেছে। পশ্চিম থেকে বিমানেও রোজ সৈন্য আসছে।

নতুন হিসেবে সৈন্যসংখ্যা ৩০,০০০-এরও বেশি বলে উল্লেখ করা হয়। কোনো কোনো হিসেবে এই সংখ্যা ৬০,০০০ বলা হচ্ছে। তবে সেটা খুব বেশি বলে মনে হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য আরেক সমস্যা হচ্ছে সকল বিমানকে আসতে হয় ২৮০০ মাইল ঘুরে সিংহল হয়ে, দুইজন কাশ্মিরি কর্তৃক ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান হাইজ্যাক করে পাকিস্তানে নিয়ে তা উড়িয়ে দেওয়ার পর বিগত ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকবিমানের উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

এখন সিংহল যদি মন পাল্টে পাকিস্তানকে অবতরণ ও জ্বালানি গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবে সামরিক অভিযান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে বিমানের জ্বালানি তেলের মজুদ হ্রাস পেয়েছে এবং তেল সরবরাহের জন্য তারা বার্মার শরণাপন্ন হয়েছে।

তবে শেষ পর্যন্ত ভূপ্রকৃতিই হয়তো নির্ধারক উপাদানে পরিণত হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনার মতো শহর সেনাবাহিনী আরো কিছুকাল তাদের কব্জায় রাখতে পারলেও দেশের গভীর অভ্যন্তরে তাদের কার্যকরভাবে অনুপ্রবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

ডেটলাইন : নয়াদিল্লি
এপ্রিল ৪, ১৯৭১

পাকিস্তান : 'এসবই খেলার রীতি'— তবে ভয়ঙ্কর ও নির্দয় এক খেলা

'এসবই হয়ে উঠেছিল জরুরি, একান্ত জরুরি,' পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা-আন্দোলন দমন করতে পাকবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে বহিষ্কৃত কতক বিদেশী সাংবাদিককে অবহিত করতে গিয়ে একথাই বললেন পশ্চিম পাকিস্তানি বিমানবালা। 'আপনার দেশে এমনটা ঘটলে আপনারাও একই কাজ করতেন। খেলার রীতিই হচ্ছে এমন।'

খেলা? ঢাকায় অবস্থিত বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে এটা মনে হয়েছিল ট্যাঙ্ক, কামান ও ভারি মেশিনগান সজ্জিত হয়ে কার্যত নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর হঠাৎ-আক্রমণ—যে নাগরিকেরা বিগত ডিসেম্বরের নির্বাচনে অর্জিত তাদের রাজনৈতিক গরিষ্ঠতার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছিল অহিংস পন্থায়, ধর্মঘট ও অন্যান্য অসহযোগ পদ্ধতি অবলম্বন করে। এবং চলতি সপ্তাহান্তে যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ডের অকাট্য এমন সব তথ্য-প্রমাণ বেরিয়ে এসেছে, যার দ্বারা নিরাবেগ ভারতীয় কর্মকর্তা ও পশ্চিমা কূটনীতিকদের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নির্মূল করতে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি একেবারে বাঞ্ছাহীন।

আক্রমণ শুরু হয় ২৫ মার্চ রাতে, দশ দিনের রাজনৈতিক আলোচনা শেষে। আর্মি এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ আলোচনা চালানোর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানিদের ভেতর এমন ভাব সঞ্চার করেছিলেন যেন তাদের অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে।

এখন এটা পরিষ্কার যে, আলোচনা সফল করে তোলার কোনো ইচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ছিল না। আলোচনা তারা প্রলম্বিত করেছে স্রেফ সময় ক্ষেপণের জন্য,

যাতে করে আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য ইত্যবসরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা যায়। তবে আলোচনা যখন চলতেই থাকলো সাংবাদিক থেকে শুরু করে কূটনীতিক, প্রায় সকল দর্শকই প্রবল আশঙ্কাটি মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সবরকম দুর্লক্ষণ অবশ্য সেখানে ছিল, আকাশ ও সমুদ্রপথে আসছিল সৈন্য, যে সামরিক আইন প্রশাসক অতি নমনীয় ছিলেন, তাঁকে বরখাস্ত করা হলো, পূর্ব পাকিস্তানিদের সামরিক নির্দেশ উপেক্ষা করে বরং শেখ মুজিবুর রহমানের কথা মেনে চলার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ছিল স্বভাববিরুদ্ধ নিশ্চুপতা।

সাংবাদিকরা এইসব লক্ষণ তুলে ধরলেও যখনই আলোচনায় কিঞ্চিৎ অগ্রগতির কথা উঠেছে তারা সেটাকে লুফে নিয়েছে। কেননা তেমনটা ঘটাই তো উচিত ছিল। কিন্তু এ সমস্তই এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বরং জয়ী হয়েছে সামরিক চিন্তাধারা।

কিন্তু শক্তির আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা দৃশ্যত তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও ৭৫ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানির অনুভূতির গভীরতা দুই-ই বিচার করতে ভুল করে ফেলেছে।

'তারা ভেবেছিল কিছু বুলেট খরচ করলেই লোকজন ভয় পেয়ে যাবে', বলেছেন ভারতীয় সীমান্তবর্তী কলকাতার পুলিশ কমিশনার রণজিৎ গুপ্ত। 'এটা একেবারেই অবাস্তব—এর মধ্য দিয়েই বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তানিদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কত কম জানে।'

গোলাগুলি বর্ষণের প্রথম পর্বের দ্বারা সন্ত্রস্ত জনগণকে অনুগত করে তোলা যায় নি। এটা এখন পরিষ্কার, আর্মি হয়তো মহানগরী ও বড় শহরগুলোর ওপর প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নদীস্নাত সুপ্রাচীন গ্রাম এলাকায় তারা ব্যাপক গেরিলা তৎপরতার সম্মুখীন হবে। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের সরবরাহ লাইন ও চলাচল এতে এমন বিপর্যস্ত হবে যে, স্বাধীনতা আন্দোলন পরিণামে বিজয়ী হবে।

ভারতে পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমীদের সামরিক অভিযানকে চট করে তুলনা করে বসেন হিটলারের অভিযানের সঙ্গে। কলকাতার একটি পত্রিকার হেডলাইন ছিল, 'পাকবাহিনীর অমানুষিক নির্যাতন'। আরেক পত্রিকার শিরোনাম : 'জল্লাদসুলভ' এবং লিখেছে, 'দখলদার পাকবাহিনী বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তা নাৎসি সন্ত্রাসের কালো অধ্যায়ের চাইতেও কৃষ্ণবর্ণ'। ভারতীয় পার্লামেন্ট এই ঘটনাকে অভিহিত করেছে, 'প্রতিরক্ষাহীন মানুষকে ব্যাপকভাবে হত্যা যা গণহত্যারই শামিল।'

সরকার নিশ্চুপ

বিশ্বের অন্য প্রায় সকল সরকারই নিশ্চুপ রয়েছেন। কলকাতায় জনৈক আমেরিকানকে এক কর্মকর্তা জিগ্যেস করলেন, 'আপনার দেশ এই হত্যাযজ্ঞের নিন্দা করে না কেন ? এটা কোনো জলোচ্ছ্বাস নয়, প্রকৃতির কোনো বৈরিতা নয়—এখানে মানুষ মানুষকে জবাই করছে।'

বাঙালিরা একটি তাৎপর্যপূর্ণ রেখা অতিক্রম করেছে— এমন একটি বিভাজন রেখা যা শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইকে ফারাক করে রেখেছিল। এই রেখা হয়তো তারা অতিক্রম করেছে ২৪ মার্চ, আক্রমণের রাতে। কিংবা হয়তো এটা ঘটেছিল আরো আগে, ১ মার্চ, যখন সেনাবাহিনী প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্থগিত ঘোষণা করলেন জাতীয় সংসদের অধিবেশন, পাকিস্তানের বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শাসনতন্ত্রের মুসাবিদা যে সংসদে দু'দিন পর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত এই সংসদে ছিল শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ দলের প্রাধান্য, যারা চাইছিল ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানি ক্ষমতাচক্র, সেনাবাহিনী ও বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের কাছে এইসব শর্ত ছিল একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। সঙ্কট নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা তারা শুরু করেছিল আপসরফার ইঙ্গিত দিয়ে এবং পরে নিয়ে এলো দুধের মধ্যে চোনা-স্বরূপ জুলফিকার আলী ভুট্টোকে। পশ্চিম পাকিস্তানের এই প্রধান রাজনৈতিক নেতা যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আওয়ামী লীগ বড্ড বেশি স্বায়ত্তশাসন চাইছে, 'সার্বভৌমত্বের প্রায় কাছাকাছি'—তখন আলোচনায় অচলাবস্থা শুরু হলো। এরপর হঠাৎ করে ঘটলো সেনাবাহিনীর আক্রমণ।

আক্রমণের পরদিন সকালে কড়া সামরিক প্রহরায় ভুট্টো ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের মিত্রভূমিতে। সেখানে এই রাজনৈতিক নেতা দ্রুতই ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।'

কিন্তু একটি অখণ্ড মুসলিম দেশ হিসেবে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে ধর্মীয় বুলির অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হবে। এমনটা ভাবা হয়েছে যে, দুই অংশকে একত্র ধরে রেখেছে যে সামাজিক আঠা, সেটা হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু এই কাজে ধর্ম কখনোই যথেষ্ট ছিল না।

হয়তো এজন্য দীর্ঘ সময় লাগতে পারে, কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক উত্থান ও পাকবাহিনীর আক্রমণের বর্বরতার যাঁরা সাক্ষী, তাঁরা কেউ এ বিষয়ে আর সন্দেহ পোষণ করেন না। এবং এখন, বর্তমানে ক্ষত-বিক্ষত তাঁর বাসভবনে সমবেত ভক্ত জনতার উদ্দেশে অতীতে যেমনটি বলতে পছন্দ করতেন শেখ মুজিব : 'সংগ্রাম, সংগ্রাম, চলবেই চলবে।'

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
এপ্রিল ৭, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসা বিদেশীরা বলেছে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের কথা

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম থেকে ৩৪ ঘণ্টার সমুদ্রযাত্রা শেষে আজ এখানে পৌঁছেছেন সে-দেশ ছেড়ে আসা শতাধিক বিদেশী। স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য পাক আর্মির প্রচেষ্টা সম্পর্কে সর্বশেষ প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্ট তাঁরা বয়ে এনেছেন।

ওলন্দাজ ছাত্র জন মার্টিনুসেন বলেছেন, 'এটা গণহত্যা।'

নিউইয়র্কের নিউ রচেলের নিল ও'টুল বলেছেন, 'আমরা দেখেছি আর্মি বেসামরিক নাগরিকদের গুলি করছে। আমি বেশিকিছু বলতে চাই না, কেননা সে ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।' তিনি অনুরোধ করলেন তাঁর সংগঠনের নাম যেন উল্লেখ না করা হয়।

সংঘর্ষের কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে বসে থাকা মাল খালাসে অক্ষম পণ্যবাহী জাহাজে করে সতেরো জাতির ১১৯জন বিদেশী আজ বিকেলে কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছেছেন। সবচেয়ে বড় দুই দলের মধ্যে রয়েছেন ৩৭জন আমেরিকান ও ৩৩জন বৃটিশ।

ক্ল্যানি ম্যাকনেয়ার জাহাজের গ্যাংওয়ে বেয়ে নেমে এলে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান কূটনীতিক কর্মকর্তারা এবং ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিকের দল।

দেশত্যাগীদের কেউ কেউ কথা বলতে না চাইলেও অন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রামের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। সংঘর্ষের ফলে ৪০০,০০০ নাগরিক অধ্যুষিত নগরীর কী হাল হয়েছে, সে সম্পর্কে এ পর্যন্ত খুব সামান্যই জানা গিয়েছিল।

বিদেশীরা জানিয়েছেন যে, সর্বাংশে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী কয়েকদিনের লড়াইয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানি

প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের শহর থেকে হটিয়ে দিয়েছে।

তবে, তাঁরা আরো বলেছেন, শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কর্ণফুলি নদীতীরে এসে আর্মির নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়। নদীর দক্ষিণে সবকিছুই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে, যে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছে নাগরিকজন এবং স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বনকারী পূর্ব পাকিস্তানি পুলিশ, ই.পি.আর ও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সদস্যদের নিয়ে।

বিদেশীরা বলেছেন যে, গতকাল সকালে রওনা হওয়ার সময়েও তাঁরা শহরের সীমানায় গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছেন। তাঁরা বলেন, অধিকাংশ নাগরিক শহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে গেছেন।

আর্মি বস্তি পোড়াচ্ছে

বিদেশীরা আরো জানিয়েছেন যে, ২৬ মার্চ শুক্রবার খুব সকালে লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং স্বাধীনতার প্রবল সমর্থক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীর্ণ বস্তিগুলো সেনাবাহিনী পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। গতকাল সকালে সেনাপ্রহরায় যখন তাঁদের বন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো তখনো এসব বাঁশের ঘরবাড়ির পোড়া ছাই ধিকিধিকি জ্বলছিল।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষে রেডিও পাকিস্তান দাবি করেছে যে, গোটা পূর্ব পাকিস্তান শান্ত রয়েছে এবং জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

'কোনো কিছুই শান্ত নয়, কিছুই স্বাভাবিক হয়ে আসে নি', বলেছেন মিস্টার মার্টিনুসেন। ডেনমার্কের আরহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ-র পাঠক্রমের অংশ হিসেবে পাকিস্তানি রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য তিনি স্ত্রী কারেনকে নিয়ে সাত মাস আগে চট্টগ্রাম এসেছিলেন।

তিনি আরো বললেন, 'ওরা পরিকল্পিতভাবে গরিব মানুষদের বাড়িঘর পুড়িয়েছে, কেননা ওদের মনে হয়েছিল এইসব বস্তিতে ভালোভাবে তল্লাশি চালানো সম্ভব নয়। যথেচ্ছ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো তারা উপভোগ করছে বলেই মনে হয়।'

দোকানে ও রাস্তায় বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার কয়েকটি ঘটনার বর্ণনাদানকারী মিস্টার মার্টিনুসেন ৭৫ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে আশাবাদী। এই পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা লড়ছে হাজার মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা পৃথককৃত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতা আন্দোলন

কৃশকায় এক ছাত্র বললেন, 'এতো বিপুলসংখ্যক বাঙালি যে বাংলাদেশ চাচ্ছে, তারা সেটা পাবে বলে আমি নিশ্চিত।'

তাঁর মতের প্রতিধ্বনি করলেন ২৬ বছর বয়স্ক মিস্টার ও'টুল। 'সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করছে', তিনি বললেন, 'নিয়ন্ত্রণ করছে বর্বর শক্তি ও সন্ত্রাস দ্বারা। সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। তারা নাগরিকদের গুলি করছে। আমরা বহু লাশ দেখেছি, মৃত্যুর পচা গন্ধ পেয়েছি।'

তিনি আরো বললেন, 'হেনস্থা ও মারধোর করার অনেক ঘটনাও রয়েছে। রয়েছে বহিরাগতদের দ্বারা যথেচ্ছ লুট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা।'

প্রতিশোধের ঘটনা

'বহিরাগত' বলতে কী বোঝাচ্ছেন সেটা অবশ্য মিস্টার ও'টুল ব্যাখ্যা করেন নি—তবে তিনি দৃশ্যত পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত পশ্চিম পাকিস্তানিদের কথাই বলছিলেন।

অন্যান্য উদ্বাস্তু বলেছেন পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের হত্যা করে বাঙালিদের প্রতিশোধ গ্রহণের কথা।

বিদেশীরা জানিয়েছেন যে, চট্টগ্রামে সন্ধে সাতটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ রয়েছে, তিনদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছে কেবল শহরের কতক এলাকায়, কাজ দেওয়ার মতো কোনো বাঙালি নেই বলে গরিবরা কার্যত ঘরে বসে রয়েছে।

তীব্র লড়াইয়ের সময় দেশত্যাগীদের কেউ কেউ তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে হোটেল আগ্রাবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের ফাঁকা বাড়িতে সৈন্যরা এসে ঘুরে গেছে।

আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড জে. ম্যাকনাস শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'সৈন্যরা ছিল অতিশয় ভদ্র। তারা আমার ভাঁড়ারের সমস্ত হুইস্কি পান করে শেষ করেছে, তবে গ্লাসগুলো ফেরত দিয়েছে। অতিশয় সৎ বটে।'

ডেটলাইন : আগরতলা, ভারত
এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

অব্যাহত হত্যাযজ্ঞের মধ্যে বাঙালিদের মন্ত্রিসভা গঠন

[ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বেশ অভ্যন্তরে চারদিনের সফর সদ্য সমাপন করে নিউইয়র্ক টাইমস–এর দিল্লি সংবাদদাতা এই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।]

যদিও পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের বড় অংশ নিহত হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ এবং পাইকারি গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে, তা সত্ত্বেও আন্দোলনের হাইকমান্ডের কতক সদস্য বেঁচে আছেন এবং তাঁরা একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শেখ মুজিবের প্রধান সহকারী তাজউদ্দিন আহমদ, যাঁর দল আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা–অভিমুখী পদক্ষেপ পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক অভিযান বয়ে এনেছে।

বর্তমান সংবাদদাতা কর্তৃক ঘুরে আসা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এক এলাকায় অন্তত ছ'জন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা একত্র হয়ে তাঁদের অভিহিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে মনোনীত করেছেন। তাঁরা শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন, তবে অপ্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা স্বীকার করেন যে, তিনি বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে রয়েছেন।

একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্যাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বলে চলেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে, অপরদিকে বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি ফুটে উঠছে।

যুদ্ধ প্রতিদিন

বিশ্বস্ত সূত্রে বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিদিনই যুদ্ধের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানির দলে দলে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী সেনাবাহিনীর আশ্রয় পেতে কিংবা তাতে যোগ দিতে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু তাদের যৎসামান্য জিনিসপত্র বস্তায় অথবা পিজবোর্ডের সুটকেসে ঠেসে ভারতে চলে

আসছে সাময়িক আশ্রয়ের সন্ধানে।

বর্তমান সংবাদদাতা দেখেছে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় কিংবা লুকোবার জায়গা থেকে বঞ্চিত করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কুমিল্লার বহির্সীমায় বাঁশ ও ছনের দগ্ধ ঘর থেকে যখন ধোঁয়া উঠছিল আকাশে, চক্কমণরত শকুনেরা নেমে আসছিল মাটিতে, নিহত কৃষকের লাশের ওপর, যে লাশ নিয়ে ইতিমধ্যে কুকুর ও কাকের মধ্যে টানাটানি চলছে।

পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির কতজনকে পাক আর্মি হত্যা করেছে নিশ্চিতভাবে তা জানবার কোনো উপায় নেই। তবে বিভিন্ন সূত্রের নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট অনুযায়ী, তা অন্তত হাজার হাজার তো বটেই, কেউ কেউ আরো বেশিও বলে থাকেন।

কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ জারি করে পূর্ব পাকিস্তানে সকল বিদেশী সাংবাদিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অধিকৃত গ্রাম এলাকা থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা যায়— যার অনেক কিছুরই পাক আর্মি বিরোধিতা করে থাকে— পাকবাহিনী স্বাধীনতা আন্দোলন দমনকল্পে পূর্ব পাকিস্তানের সকল নেতা ও সম্ভাব্য নেতাদের হত্যা করেছে, গোটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছারখার করে দিয়েছে।

আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আর্মি, এখন যা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা গঠিত, হত্যা করেছে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন অন্যদের, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যোগ থাকুক কিংবা না-ই থাকুক।

২৫ মার্চ সেনা অভিযান শুরুর পর যেসব বাঙালি অফিসার ও সৈন্য ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে গেরিলা দলে যোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিনী তাঁদের হত্যা করেছে। বেশির ভাগ অফিসারের পরিবারের লোকজনকে হত্যা করা হয়েছে, পালাতে পেরেছেন মাত্র অল্প কয়েকজন।

নৌযান ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে আর্মি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি— খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, পাটকল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কূপ ধ্বংস করেছে।

'এর ফলে দেশটি ২৫ বছর পিছিয়ে গেল', বলেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাগিচা থেকে ভারতে পালিয়ে আসা একজন স্কটিশ চা-বাগান ম্যানেজার। 'পাক আর্মিকে ঠেকাতে মুক্তিবাহিনী রেললাইন ও সড়ক উড়িয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যদি তাঁরা স্বাধীনতা অর্জন করে তাহলে একেবারে শূন্য থেকে তাঁদের শুরু করতে হবে।'

এই ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গে পালিয়ে আসা অপর দুই বাগানের ম্যানেজার তাঁদের নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন। সে ক্ষেত্রে এখনও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বৃটিশ পরিবারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা করছেন।

ফাঁকা ট্রাকের ওপর আক্রমণ

এই তিন দেশত্যাগী জানালেন যে, ভারত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহনকারী যে নয়টি

ট্রাক বিমান আক্রমণে ধ্বংস করা হয়েছে বলে রেডিও পাকিস্তান দাবি করেছে আসলে তা ছিল তাদের বাগানের উঠোনে জড়ো করা খালি ট্রাক।

কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার মতো শহরগুলোর মোট অধিবাসীর মাত্র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ এখন সেখানে রয়েছে। ছোট শহরগুলোও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, চট্টগ্রামের ৪ থেকে ৫ লক্ষ এবং কুমিল্লার প্রায় ১ লক্ষ।

পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বাংশে প্রায় সর্বত্র কামানের গোলাবর্ষণের গুরুগম্ভীর শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সংখ্যা ও অস্ত্রশক্তিতে অনেক দুর্বল প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পরিচালিত প্রতিটি গেরিলা আক্রমণ অথবা উত্যক্তকারী ঘটনার বদলা পাকবাহিনী নিচ্ছে বেসামরিক লোকজনের ওপর।

'বেজন্মা ভীতুর দল', বললেন তরুণ বাঙালি লেফটেন্যান্ট, কুমিল্লার ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁর ব্যাটালিয়ন নির্মূল করার প্রচেষ্টাকারীদের ফাঁকি দিয়ে যিনি পালিয়ে বের হয়ে এসেছেন। 'আমরা তো তাদের সামনে যুদ্ধের ফ্রন্ট হাজির করেছি। আমরা ইউনিফর্ম্ পরেই রয়েছি। কিন্তু তারা কেবল বেসামরিক নাগরিকদের আক্রমণ করে চলেছে।'

বিচ্ছিন্নতাবাদী সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার, অস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন ও প্রয়োজনীয় সরবরাহের একান্ত অভাব। তাঁদের কেউ কেউ নগ্নপদ। সবচেয়ে ভারি যে অস্ত্র তাদের রয়েছে সেটা ৩ ইঞ্চি মর্টার। তবে কিছু ভারি কামান তারা দখল করেছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ব্যবহার করছে জেট জঙ্গিবিমান, ভারি কামান ও গানবোট। এর বেশির ভাগ এসেছে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট চীন থেকে।

বাংলা বাহিনীর সঙ্গে

ভারত পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহায়তা করার জন্য অস্ত্র ও সৈন্য পাঠাচ্ছে বলে পাকিস্তান সরকার যে অভিযোগ করেছে সংবাদদাতাদের কাছে তা সত্য প্রমাণিত হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানি ইউনিটগুলোতে কোনো ভারতীয় সৈন্য দেখা যায় নি। তারা মূলত ব্যবহার করছে পুরনো এনফিল্ড ও গারান্ড রাইফেল এবং কিছু চৈনিক অটোমেটিক রাইফেল ও মেশিনগান। বাঙালিরা হয় এগুলো দখল করেছে অথবা ইউনিট থেকে পালিয়ে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

৩০০,০০০ সদস্য সম্বলিত পাকিস্তান আর্মিতে বাঙালির সংখ্যা ১০ শতাংশেরও কম। আক্রমণের প্রথম দিনগুলোতে তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিহত হওয়ার পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা প্রায় সর্বাংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং এঁরাই হচ্ছেন বাহিনীর একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অংশ।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত বাহিনী ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৩০০০ সদস্য এবং ভারতের সঙ্গে সীমান্ত প্রহরার কাজে নিয়োজিত আধা-সামরিক বাহিনী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর

আরো প্রায় ৯০০০ সদস্য।

বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনীর বাদবাকিরা হচ্ছেন সশস্ত্র পুলিশ, সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্য মিলিশিয়া ও নবীন রিক্রুট।

রাজনৈতিক সঙ্কট শুরুর আগে পাকিস্তান আর্মির ২৫,০০০ সৈন্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে নিয়ে আসা হয়েছে বিপুলসংখ্যক সৈন্য।

কোনো কোনো হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যসংখ্যা ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের বড় অংশই পাঞ্জাবি ও পাঠান। তারা উভয়ে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষভাবে পাঞ্জাবিরা, বাঙালিদের অবজ্ঞার চোখেই দেখে থাকে।

গড়ে একজন গেরিলা যোদ্ধার ভাগে ৩০ থেকে ৪০ রাউন্ড গুলি জুটলেও তাঁদের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পাকবাহিনী তাঁদের পরিবারের কোনো সদস্য অথবা গোটা পরিবারকে হত্যা করেছে এবং এটা তাদের সংগ্রামী চেতনায় ইন্ধন যুগিয়েছে।

'ওরা আমাকে এতিম করে দিয়েছে,' বললেন একজন সৈনিক, অনেকের মতোই তাঁর চোখ ছলছলে এবং যা ঘটেছে বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, 'আমার জীবনের আর কোনো মানে নেই।'

বেশ ক'দিন থেকে যেমন চলছিল দিন দুই আগেও তেমনি পাকবাহিনী কুমিল্লার কাছে ভারতীয় সীমান্ত থেকে এক মাইলের মধ্যে গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমানবন্দরের চারধারে পাঁচমাইল এলাকা জুড়ে গেরিলাদের আশ্রয় নেওয়ার মতো সবধরনের সুযোগের অপসারণ। খবরে জানা যায়, গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়েই তারা এমন কাজ করে চলছে।

এলাকার গেরিলা কমান্ডার ৩২ বছর বয়স্ক খালেদ মোশাররফ পাকিস্তানি সৈন্যদের হয়রানি করার জন্য ১০ সদস্যের একটি প্যাট্রোল পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান সংবাদদাতা এই প্যাট্রোল দলের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের তিনজনের পায়ে কোনো জুতো ছিল না।

ধান খেতের আড়াল অবলম্বন করে প্যাট্রোল দল পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রায় ২০০ গজের মধ্যে পৌছে গেল। সৈন্যরা তখন ফসফরাস গ্রেনেড ছুঁড়ে কুঁড়েঘরগুলোতে আগুন লাগাচ্ছিল। বাঙালিদের কাছে কয়েকটি চীনা অটোমেটিক বন্দুক ছিল। তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে পাকবাহিনীও ত্বরিত জবাব দিতে লাগলো। প্রায় ২০ মিনিট ধরে অবিরাম গোলাগুলি চললো। এরপর বাঙালিরা হামাগুড়ি দিয়ে বাঁধের ওপারে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এলো।

গেরিলা দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় খুবই দুর্বল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। ক্যান্টনমেন্ট ও বিমানবন্দরসহ প্রধান শহর–বন্দরে পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাঙালিরা এখন গেরিলা কায়দার লড়াইয়ে মনোযোগ দিয়েছে।

শক্তি বৃদ্ধি করে পাকিস্তানি সৈন্যরা এখন গ্রামের দিকেও হানা দিচ্ছে এবং মোটরযানের বহর নিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শহরগুলোর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করছে। কতক বহর এ

কাজে সফল হলেও অনেকগুলো হয় নি, কেননা গেরিলারা প্রায় নিয়মিতভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে সড়ক, নৌ ও রেল যোগাযোগ।

বিচারের সম্মুখীন শেখ মুজিব

গেরিলারা যখন লড়ে চলেছে তাঁদের নেতারা স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আনীত দেশদ্রোহ মামলায় বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন শেখ মুজিব, বিদ্রোহী আন্দোলনের ৫১ বছর বয়স্ক প্রতীক। সরকার ঘোষণা করেছে ২৫ মার্চ রাত্রে আর্মি শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করেছে।

দৃশ্যত আর্মি যুদ্ধের প্রথম পর্বে বিজয়ী হয়েছে এবং বাঙালিরা নির্ভর করছে বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টির ওপর, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যা শুরু হবে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের জটিল পথ—গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুত্র জলধারা ও সহস্র নদীর আঁকিবুঁকি—পশ্চিম প্রদেশের শুষ্ক ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত পাঞ্জাবি ও পাঠানদের কাছে অপরিচিত। যখন বর্ষায় নদী ফুলে উঠবে এবং মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়বে, তখন এই অপরিচিতি আরো বাড়বে।

'আমরা এখন বর্ষার অপেক্ষায় রয়েছি', বললেন এক বাঙালি অফিসার। 'তারা পানিকে এতো ভয় পায় যে আপনি ভাবতেই পারবেন না এবং আমরা হচ্ছি জলের রাজা। তারা তখন ভারি কামান ও ট্যাঙ্ক নিয়ে চলতে পারবে না, জঙ্গি বিমান উড়তে পারবে না। প্রকৃতি হবে আমাদের দ্বিতীয় বাহিনী।'

পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা বিষয়ে অধিকাংশ বাঙালি বেশ তিক্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাই পাশ্চাত্য-ঘেঁষা এবং তাঁরা ওয়াশিংটনের সমর্থন-প্রত্যাশী। এমন কি তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত আমেরিকান অস্ত্র নিয়েও ক্ষোভ বেশ প্রবল।

'আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করছি'

'তুমি কি জানো ওরা আমাদের হত্যার কাজে ব্যবহার করছে তোমাদের বিমান, তোমাদের রকেট, তোমাদের ট্যাঙ্ক ?' চোখ কুঁচকে উত্তেজিত গলায় মার্কিন সংবাদদাতাকে জিগ্যেস করলো এক বাঙালি সৈনিক। 'যা করে চলেছো তা নয়, আমরা তোমাদের সাহায্য চাইছি,' একই অভিমত ব্যক্ত করলেন আরো অনেকে।

পাক সরকারের প্রতি পিকিংয়ের সমর্থন থাকবে ধরে নিয়েছে বলে আর্মির চীনা অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে বাঙালিরা ততো বিস্মিত নয়। কতক বাঙালি অফিসার মনে করেন চীনের সঙ্গে পূর্ব যোগসাজশে অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাঁরা জোরের সঙ্গে বলতে চান পিকিংয়ের পূর্ণ সমর্থন লাভের নিশ্চয়তা ছাড়া আর্মি কখনোই এমন কাজে নামতো না।

এমন কি আক্রমণ ঘটার আগেও বাঙালিরা ভেবে অবাক হতো পশ্চিমী শক্তি ও অন্যরা কেন তাঁদের দাবি সমর্থন করছে না। তাঁদের হতাশা এখন পরিপূর্ণ।

'একটা গণহত্যা চলছে এবং দুনিয়ার মানুষ স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে', বাঙালি এক ছাত্র মন্তব্য করলো। 'কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বলে নি। দুনিয়া থেকে কি বিবেক-বিবেচনা উঠে গেছে?'

এমনি তিক্ত সমালোচনা দ্বারা অভিযুক্ত হয় নি ভারত। পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের নিন্দা করেছে ভারত এবং হত্যাযজ্ঞ থামাতে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে অন্যান্য দেশকে বোঝাতে চেষ্টা করছে।

সীমান্ত এলাকার ভারতীয় নাগরিক ও কর্মকর্তারা উদ্বাস্তু ও অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে, তবে এই সংবাদদাতা কোনো অস্ত্রের চালান সীমান্ত দিয়ে পার হতে দেখেন নি, যেমনটা পাকিস্তান অভিযোগ করছে ও নয়াদিল্লি অস্বীকার করছে।

শরণার্থীরা নির্যাতনের বিবরণ দিচ্ছে

শরণার্থী ও দেশত্যাগী বিদেশী উভয়েই বয়ে এনেছে হত্যা ও বর্বরতার নানা কাহিনী। চট্টগ্রাম এলাকার পাটকলের ম্যানেজার এক বিদেশী জানালেন যে তিনি আর্মির হাত থেকে বাঁচতে তিন ঘণ্টা একটা গর্তে লুকিয়ে ছিলেন। তখন দেখতে পেয়েছেন সৈন্যরা রাস্তা দিয়ে একটি ট্রাক বহর নিয়ে চলেছে। সামনের ট্রাকে বন্দুকের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কয়েকজন বাঙালিকে, তাদের বলা হয়েছে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে। স্লোগান শুনে লুকনো জায়গা থেকে অন্য বাঙালিরা বের হয়ে এলে তাঁদের ওপর মেশিনগানের বর্ষিত করা হয়।

একজন বাঙালি সৈনিক বললেন, 'ওরা আমাদের গভীর অতলে টেনে নামাতে চায়, যেন জাতি ফিরে যায় অষ্টাদশ শতকে। যেন দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ এবং আমরা ঘাস খেয়ে বাঁচতে বাধ্য হই। ওরা নিশ্চিত হতে চায় যেন আর কখনো আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।'

প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে যে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি ও অবাঙালি, বিশেষভাবে ব্যবসায়ীদের, হত্যা করে পাল্টা শোধ নিচ্ছে।

তবে বাঙালিদেরকে হত্যা, যা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, সেটা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল অনেক আগে। আর্মি ও পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থের সঙ্গে যাদের দীর্ঘকালের দহরম-মহরম, পূর্ব পাকিস্তানে অকার্যকর সেই ধর্মভিত্তিক দল মুসলিম লীগ আর্মিকে সাহায্য করছে ছাত্র ও অন্যান্য সম্ভাব্য নেতাকে খুঁজে বের করতে।

স্ত্রী ও এক বছরের পুত্রকে নিয়ে ঢাকা থেকে সাতদিন হেঁটে জনৈক প্রকৌশলী গতকাল ভারতে এসে পৌঁছেছেন। সরকারি চাকুরে এই প্রকৌশলী জানালেন যে, যদিও তিনি আওয়ামী লীগের সদস্য নন কিংবা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও অংশ নেন নি, তা সত্ত্বেও তিনি দেশ ছেড়েছেন, কেননা, 'শিক্ষিতদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে।'

মৃদুকণ্ঠে তিনি জানালেন, 'আমি যদি রয়ে যেতাম তাহলে মৃত্যুবরণ করতাম, নিশ্চিত মৃত্যু।'

ডেটলাইন : আগরতলা, ভারত
এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

আটক বাঙালি অফিসারের ভয়ঙ্কর প্রহরগুলো

মার্চ রাতে, দবিরের বেশ মনে আছে, তিনি এবং ৫৩তম ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের অপর দুই বাঙালি অফিসার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তাঁরা শুনতে পান ঘরের ভেতর তলব করা পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের উদ্দেশে কমাণ্ডার বলছে :

'তোমরা সবাই এখন কুমিল্লা যাবে এবং আমি দেখতে চাই সকালের মধ্যে গোটা কুমিল্লা লাশে ভরে গেছে। যদি কোনো অফিসার এ কাজ করতে ইতস্তত ভাব দেখায় তবে তার জন্য আমার অন্তরে করুণার লেশমাত্র থাকবে না।'

দবির জানিয়েছেন, পাঁচদিন গৃহবন্দী করে রাখার পর ৩০ মার্চ শেষ বিকেলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাঁকে ও দুই বাঙালি অফিসারকে হত্যা করার জন্য তাদের এক অফিসারকে পাঠায়। আহত দবির মৃত্যুর ভাণ করে পড়ে থেকে পরে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তিনি এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

আপন সহকর্মীদের খুন

দবিরের অভিজ্ঞতা কোনো ব্যতিক্রমী কিছু নয়। পূর্ব পাকিস্তান-ত্যাগী বিদেশী ব্যক্তিবর্গ এবং বাঙালি সৈনিক ও উদ্বাস্তুদের মতে, গোটা পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সামরিক নেতৃত্বহারা করার লক্ষ্যে পাকবাহিনী ইউনিফর্ম্ পরিহিত তাদের বাঙালি সহকর্মীদের হত্যা করছে।

সৈনিক-আচরণবিধির এই লঙ্ঘন—যাদের সাথে মিলে একদা লড়াই করেছে আজ তাদেরই হত্যা করছে অফিসার ও জওয়ানরা—এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় সংঘর্ষের আরেক মাত্রা, পাঞ্জাবি ও পাঠান

পশ্চিম পাকিস্তানিরা ৭৫ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানির প্রতি যে তীব্র জাতিগত ঘৃণা অনুভব করে তার স্বরূপ।

বাঙালি সৈনিক নিধন শুরু হয়েছে সেই একই রাত্রিতে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে পাকবাহিনীর অভিযান শুরু হলো।

দবির, ২০ বছর বয়স্ক অবিবাহিত হালকা-পাতলা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরের এক ঘাঁটিতে বর্তমান সংবাদদাতার কাছে সেই রাত ও তাঁর পরবর্তী দিনগুলোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

দবির তাঁর আসল নাম নয়—তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন এই বিবেচনা থেকে যে, তাঁর বাবা-মা, ভাই ও তিন বোন—ওরা হয়তো এখনো বেঁচে রয়েছে।

মৃদু নিরুত্তাপ কণ্ঠে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন :

পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা কমান্ডারের দপ্তর থেকে বের হয়ে অস্ত্রাগারের দিকে চলে যায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র বুঝে নিতে। নিরস্ত্র তিন বাঙালি অফিসারকে ডেকে নিয়ে কার্যত তাদের গৃহবন্দী করা হয়, যদিও কম্যান্ডার জানান, তাঁদের দাপ্তরিক কাজ দেওয়া হয়েছে।

কম্যান্ডারের ঘরের পাশে আটক অবস্থায় সেই রাতে দবির কিছুতেই ঘুমুতে পারছিলেন না। রাত একটার দিকে সামনের চত্বর থেকে সাত-আটটা গুলির শব্দ পাওয়া গেল।

পরের তিনদিন দবির ও তাঁর দুই সঙ্গী, উভয়েই ক্যাপ্টেন, কড়া পাহারায় থেকে কাগজপত্র নাড়াচাড়া ও মাঝেমধ্যে টেলিফোনে জবাব দিয়ে কাটালেন। দূর থেকে ভেসে আসা মেশিনগান, হালকা অস্ত্র ও কামানের গোলার শব্দ তাঁরা পাচ্ছিলেন।

জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন রেজিমেন্টের ৬০ জন বাঙালি সৈন্যকে দু'হাত ওপরে তুলিয়ে একটি ভবনের পেছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর শোনা গেল একটানা গুলির শব্দ, বোঝা গেল সব বাঙালিকেই মেরে ফেলা হয়েছে।

২৯ মার্চ সবরকম বাহানা ঝেড়ে ফেলে তিনজন অফিসারকে একটি ঘরে তালাবন্দী করা হলো। তাঁদের রাত কাটলো ভয়ে ভয়ে। ৩০ তারিখ বিকেলে এক পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার দরজার কাছে এসে সাব-মেশিনগানের বাঁট দিয়ে কাচ ভেঙে খানখান করলো। একজন বাঙালি অফিসার তার সামনে লুটিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলো। জবাব হিসেবে গুলি ছুটলো এক পশলা। পশ্চিম পাকিস্তানিটি এরপর অপর ক্যাপ্টেনকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো।

দবির নিজেকে দরজার পাশের দেয়ালে সেঁটে রেখেছিল। তালাবদ্ধ দরজা খুলতে ব্যর্থ হয়ে গালমন্দ করতে করতে চাবি আনতে ফিরে গেল পশ্চিম পাকিস্তানিটি।

দবির লোহার খাটের নিচে শুয়ে দু'হাতে মাথা ঢেকে রাখলো। লোকটি আবার ফিরে এলো। দবির আমাকে জানালো, 'আমি চিৎকার করে উঠলাম। লোকটি গুলি ছুঁড়লো। আমি বুঝতে পারলাম একটা বুলেট আমাকে আঘাত করেছে। আমি এমন শব্দ করলাম যেন মরে যাচ্ছি। আমি মরে গেছি মনে করে লোকটি গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে চলে গেল।'

লাথি মেরে, খুঁচিয়ে

একটি বুলেট লেগেছিল দবিরের ডান কব্জিতে, আরেকটি চিবুক ঘষটে চলে গেছে, তৃতীয় একটি শার্টের পেছন দিক ফুটো করে গেছে। তিনজনই যে মারা গেছে সেটা নিশ্চিত বুঝে নিতে যখন অন্য অফিসাররা এলো, দবির তখন কব্জি বেয়ে–পড়া রক্ত সারা মুখে লেপ্টে দম বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে রইলো।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা লাথি মেরে, খুঁচিয়ে সব দেখে নিশ্চিত হলো। পরের দু'আড়াই ঘণ্টা ধরে সৈন্যরা দলে দলে এই দৃশ্য দেখতে আসে। এক পাঞ্জাবি সার্জেন্ট এসে দুই ক্যাপ্টেনের দেহে সজোরে লাথি লাগায়। প্রতিবারই দবির মরণপণ করে দম আটকে রাখে।

'সময় বয়ে চলে,' দবির কাহিনী বর্ণনা করে যায়, 'একসময় রক্ত শুকিয়ে আসে এবং ঘাড়ের ওপর মাছি ভনভন করতে থাকে। ঘরের ভেতর পচা দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।'

সাত ঘণ্টা পর দবির উঠে চারদিক দেখে জানালা দিয়ে চারফুট নিচে লাফিয়ে পড়ে। একজন সেন্ট্রি শব্দ পেয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু অন্ধকারে সঠিক নিশানা করা সম্ভব ছিল না। চত্বরের আশপাশের অন্যান্য সৈন্যও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু দবির সন্তর্পণে শেষ পাহারা চৌকিটিও পার হয়ে গেল। ধানখেতের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে, একটা ছোট নদী সাঁতরে দবির পালাতে সক্ষম হলেন। পরদিন গ্রামের এক ডাক্তার কব্জির বুলেট বের করে ভালোভাবে ব্যান্ডেজ করে দিলেন।

দবিরের চেহারা বালকসুলভ, ওজন মাত্র ১২০ পাউন্ড, কিন্তু এখন তাঁকে দেখলে মনে হবে পশ্চিম পাকিস্তানের কাকুল মিলিটারি একাডেমি থেকে তাঁর ক্লাসে চতুর্থ হয়ে পাস করার তিন মাসের মধ্যেই তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রবল হলেও অনিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি বললেন, 'কোনো কারণ ছাড়াই তারা আমাদের হত্যা করেছে, আমাদের বাধ্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে।'

ডেটলাইন : আগরতলা, ভারত
এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

তছনছ অর্থনীতি

বাংলাদেশের বহু এলাকার চাষী এখন আর খেতে ধান বুনছে না, কেননা পাকবাহিনী ও বাঙালি স্বাধীনতা যোদ্ধাদের মধ্যে প্রতিদিন গোলাগুলির ফলে সে আর বাইরে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

ভারতীয় ভূখণ্ড পেরিয়ে ১০০০ মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে বস্ত্রকলগুলো শস্তা সুতি কাপড় তৈরি করে চলছে যার বাজার কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই এবং সেখানে তা বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পাক আর্মি স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হচ্ছে।

পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক জীবনহানি ছাড়াও তিন সপ্তাহের যুদ্ধ দেশের উভয় অংশে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে এসব হচ্ছে তার কিছু নিদর্শন।

বর্তমান সংবাদদাতা পূর্ব পাকিস্তানে কোনো উপোষ থাকার ঘটনা প্রত্যক্ষ না করলেও গ্রামাঞ্চলে খাদ্য মজুতের পরিমাণ কমে গেছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমন কি স্বাভাবিক সময়েও পূর্ব পাকিস্তানকে বলা যেতে পারে ক্ষুধাপীড়িত এলাকা, কেননা এখানে বার্ষিক খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২৫ মিলিয়ন টন।

পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী সংবাদদাতাদের প্রবেশ পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করে রাখাতে বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ এলাকার ব্যাপক জনঅধ্যুষিত চরগুলোর কোনো সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না। গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে এখানে কেবল হাজার হাজার মানুষ মারা যায় নি, ফসলেরও ক্ষতি হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সেই থেকে রিলিফের ওপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছে চরাঞ্চলের প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ।

মার্চে ঘনীভূত রাজনৈতিক সঙ্কট এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর পরবর্তী সেনা আক্রমণের ফলে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

বিদেশী কূটনীতিক ও অন্যরা আশঙ্কা করছেন যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বর্ষা মৌসুম শুরু হলে অবস্থা আরো সঙ্গিন হবে কেননা বৃষ্টিপাতের দরুন এসময় মূল ভূখণ্ড থেকে চরাঞ্চল প্রায় পাঁচ মাস বিচ্ছিন্ন থাকে। এছাড়াও, অনুমান করা হয়, সেখানে প্রায় ১০০,০০০ দুর্গত লোকের এখনও কোনো আশ্রয় বা বাড়িঘর জোটে নি। বর্ষাকালে তাদের অবস্থা হবে করুণ।

যুদ্ধজনিত বিপর্যয় অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত করে তুলছে। সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা গঠিত পাকবাহিনী খাদ্যগুদাম, চা বাগান ও পাটকলগুলো ধ্বংস করছে। গেরিলা কায়দা অবলম্বনকারী প্রতিরোধ-যোদ্ধারা সেনাবাহিনীর চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য উপড়ে ফেলছে রেললাইন, উড়িয়ে দিচ্ছে সেতু, কেটে ফেলছে সড়ক।

চা বাগান ও পাটকলের ম্যানেজার, যাঁদের অধিকাংশ বিদেশী, বাঙালি সহকারীদের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করছে। পেছনে ফেলে আসা হাজার হাজার চা শ্রমিকদের মজুরি দেয়ার মতো অর্থের সংস্থান নেই এবং প্রায় সব বাগানেই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এসব বাগানের অধিকাংশই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট জেলাতে। পালিয়ে আসা ম্যানেজারদের মতে, চা শ্রমিকদের বেশির ভাগই হিন্দু এবং তারা ইতিমধ্যেই সীমান্ত পেরিয়ে মূলত হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে চলে যেতে শুরু করেছে।

পাকবাহিনী ব্যাঙ্ক ও দোকানপাট লুট করছে বলে জানা গেছে।

প্রতিরোধ বাহিনীর কম্যান্ডার কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী পূর্ব সীমান্তে তাঁর ঘাঁটিতে বলেন, 'পাকবাহিনীর লক্ষ্য মূলত বেসামরিক নাগরিকজন। তারা জনগণকে সন্ত্রস্ত ও ভুখা রাখতে চাইছে।'

রান্নার জন্য লবণ, তেল, কুপি-হারিকেনের জন্য কেরোসিন তেল, গ্রাম এলাকার আটাকল ও অন্যান্য ধরনের মেশিনের জন্য জ্বালানি তেল—এসবের অভাব ঘটছে।

পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন অধিবাসীর মূল আহার্য ভাত ও মাছ—এদিকে চালের মজুত কমে আসার সাথে সাথে অনেকে কাঁঠালকে নিত্যকার খাদ্যসামগ্রী করে নিচ্ছে। তরকারি হিসেবে খাওয়া যায় কাঁচা কাঁঠাল এবং ফল হিসেবে পাকা কাঁঠাল। পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে এর প্রচুর ফলন হয়। তবে এতোকাল বাঙালির খাদ্যতালিকায় কাঁঠালের অংশভাক্ ছিল গৌণ।

সামরিক সরবরাহ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এখন আর কোনো পণ্য চলাচল করছে না বলে নিজেদের দেশে যা কিছু পাওয়া যায় তার ওপরই বাঙালিদের নির্ভর করতে হচ্ছে। শত বছরের বন্যা, মহামারী, ঝড় ও ব্যাপক দারিদ্রের ভেতর দিয়ে তাঁরা বেঁচে থাকার তৎপরতায় কুশলী হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ যদিও পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে নি, তা সত্ত্বেও পূর্বে সঙ্ঘটিত প্রায় প্রতিটি অর্থনৈতিক বিঘ্ন পশ্চিমে প্রতিক্রিয়া ফেলবে।

পূর্ব পাকিস্তানের পাট ছিল দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি পণ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার বড় যোগানদার। বৈদেশিক আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে—সেনাবাহিনী লালন, বড় ব্যবসায়ীদের অর্থ যোগানো ও গণপূর্ত খাতে।

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ করে দুই অংশে বিভক্ত এই দেশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বহাল থাকা এমনি শোষণ সমঅধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে ইন্ধন যুগিয়েছে, যা পরিণামে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের বন্ধ পাটকলগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য জটিলতা বয়ে আনবে।

পূর্ব পাকিস্তান বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্য, বিশেষত সুতিদ্রব্যের প্রধান বাজার ছিল, সেই বাণিজ্য এখন বন্ধ। এই সুতা এতো নিম্নমানের যে দুনিয়ার আর কোথাও তার বাজার নেই। পশ্চিমের বস্ত্রকলগুলোকে রক্ষা করার জন্য সরকার-নির্ধারিত উচ্চ মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানে তা' বিক্রি করা হতো।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সংবাদ পাঠানোর ওপর সেন্সরশিপ আরোপের ফলে সেখানকার অর্থনীতিতে কী চাপ পড়ছে, সে সম্পর্কেও বলা কঠিন।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী শক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কতকাল যুদ্ধ করে যেতে পারবে সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এটা নির্ভর করছে মূলত নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর :

সরকারের ভাণ্ডারে কী পরিমাণ গোলাবারুদ মজুত রয়েছে। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে স্বল্পকালীন সংঘর্ষের সময় গোলাবারুদের বড় রকমের মজুত না থাকাটা খুবই প্রভাব ফেলেছিল যুদ্ধের ওপর।

বিমান ও গাড়ির জন্য জ্বালানি কতোটা সরকারের রয়েছে এবং তেল কেনার জন্য কি পরিমাণ অর্থ তার হাতে বর্তমান।

আমেরিকা এবং পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসোর্টিয়ামের অন্য সদস্যদের সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টির নীতি সাহায্য স্থগিত রাখা পর্যন্ত গড়াবে কিনা। পাকিস্তানকে প্রদত্ত কেবল মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যই বার্ষিক ১৭৫ মিলিয়ন ডলারের মতো।

পাকিস্তানকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন সবধরনের সহায়তা দিয়ে যাবে কিনা।

পাকিস্তানকে সেনা অভিযান বন্ধের জন্য পরোক্ষ হুশিয়ারি জানিয়েছে আমেরিকা, তবে, মনে হয়, কোনো কঠোর ব্যবস্থা পরিহার করে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা চালাতে ওয়াশিংটন আগ্রহী।

ডেটলাইন : বেদাই, ভারত
এপ্রিল ১৪, ১৯৭১

গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাঙালিরা

পশ্চিমবাংলা রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ছত্রখান হয়ে যাওয়া বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চিমী ইউনিটগুলো আবার সংগঠিত হতে চেষ্টা করছে। গেরিলা কায়দায় পুনরায় প্রত্যাঘাত হানার জন্য তাঁরা নিজেদের তৈরি করতে চেষ্টা করছেন।

পাকিস্তানি বাহিনী তাদের বিগত দুই সপ্তাহব্যাপী অভিযানে পশ্চিমী জেলাগুলোর সকল প্রধান শহর–বন্দর কার্যত দখল করে নিয়েছে। অধিকতর ভারি অস্ত্রসজ্জিত আরো বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে বাঙালি সৈন্যরা পিছু হটেছে, অনেক ক্ষেত্রে কোনো লড়াই না করেই। তবে তাঁরা তাঁদের অস্ত্র বিসর্জন দেন নি। বেশিরভাগ যোদ্ধাই পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের গ্রাম এলাকায় মিলিয়ে গেছেন। তিনদিন আগে উল্লেখযোগ্য বাঙালি প্রতিরোধ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানি শহর মেহেরপুর। সেখান থেকে প্রায় ছয় মাইলের মধ্যে অবস্থিত এই ভারতীয় সীমান্ত শহরে এখন অনেক বাঙালি সৈনিক ও অফিসার জমায়েত হয়েছেন আবার নিজেদের গুছিয়ে তুলতে।

মেহেরপুর কলেজের ২১ বৎসরের ছাত্র ইউসুফ গণি ধীরভাবে জানালো, 'যতদিন পর্যন্ত একজন বাঙালিও জীবিত থাকবে আমরা লড়াই থেকে ক্ষান্ত হবো না।'

কান্নায়-ভেঙেপড়া মানুষ

ছাত্রটি যখন তার কথা বলে চলেছিল তার পাশের মানুষটি কাঁদতে শুরু করলো। দু'গাল বেয়ে নেমে আসছিলো অশ্রুধারা এবং শরীর বারবার কেঁপে উঠছিলো। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, 'আমার এক খালাত ভাইকে ওরা হত্যা করেছে। সে বাজার থেকে

ফিরছিলো। ওরা পেছন দিক থেকে তাকে গুলি করে। আমি তাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।'

এই মুষড়ে-পড়া ব্যক্তি হচ্ছেন আবদুল আজিজ, মেহেরপুরের ৪২ বৎসর বয়স্ক চাল ও পাট ব্যবসায়ী। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জানালেন, গতকাল রাতে তিনি যখন মেহেরপুর ছাড়েন তখনও 'চারপাশে লাশ ছড়িয়ে ছিলো'। তিনি বলেন, সৈন্যরা খুঁজছে ছাত্র, অধ্যাপক, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের। তাঁদের হাত-পা পিছ-মোড়া করে বেঁধে পেছন দিক থেকে গুলি করা হয়।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জানালেন, সৈন্যরা দোকানপাট লুট করে, খাদ্য মজুত ধ্বংস করে। 'আমি ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত না অস্ত্র প্রশিক্ষণ পাই এবং ফিরে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারবো ততদিন পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো।'

বাঙালিরা স্বীকার করে তাঁদের গুরুতর সমস্যা রয়েছে—গোলাবারুদের অভাব, ভারি অস্ত্রশস্ত্র নেই, দেশের সর্বত্র স্বাধীনতাকামী শক্তির মধ্যে যোগাযোগ দুর্বল অথবা নেই বললেই চলে। অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবকেরই কোনো প্রশিক্ষণ নেই এবং অফিসারদের বিশেষ সংখ্যাল্পতা রয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে সশস্ত্র প্রতিরোধ পাকবাহিনী দমন করেছে এমন বক্তব্যে তাঁরা ক্ষিপ্ত বোধ করে।

আধা-সামরিক বাহিনীর এক অফিসার জানালেন, 'মেহেরপুরে প্রতিরোধ দাঁড় করানোর কথা আমরা ভাবতেই পারি না। ওদের রয়েছে মর্টার ও কামান। একমাত্র যা করার ছিল তা হলো গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ। তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়বার মতো ভারি কামান আমাদের ছিল না।'

ঘরের একপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছিল ছয়টি এনফিল্ড রাইফেল এবং দুটি শটগান। মেঝেতে রয়েছে কিছু গোলাবারুদ। অফিসারটি কথা বলবার সময় কাপড়ের থলেতে করে এনফিল্ড রাইফেলের কিছু কার্তুজ নিয়ে ঢুকলো একজন এবং মেঝেতে তা বিছিয়ে রাখলো।

জটিল ভবিষ্যতের শঙ্কা

বাঙালি স্বাধীনতা যোদ্ধাদের দৃঢ়সঙ্কল্প সত্ত্বেও ভারতে অনেক পশ্চিমী পর্যবেক্ষকই মনে করেন যে, কোনো ধরনের বৈদেশিক সহায়তা না পেলে আন্দোলনের সামনে দেখা দেবে জটিল সময়, সম্ভবত এক অসাধ্য নিয়তি।

ভারতীয়রা যে নানা ধরনের সাহায্য যোগাচ্ছে—খাদ্য, পরিবহন, হাসপাতাল, আহতদের পরিচর্যা, আশ্রয় শিবির—সেটা বেশ দৃশ্যগোচর, তবে বাঙালিরা বলছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কোনো সামরিক সহায়তা পাওয়া যায় নি।

বাঙালি সৈনিকরা, যাঁদের অধিকাংশই এসেছে সীমান্তরক্ষী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স থেকে, বেদাই এবং তার আশপাশে ক্যাম্প করে রয়েছে। কিছু সৈন্য রয়েছে সেখানকার বি.এস.এফ ঘাঁটিতে। সেখানে রয়েছে স্বাধীনতাকামী বাহিনীর কতক জিপ ও ট্রাক।

সীমান্তঘাঁটির প্রবেশ–দ্বারে একজন মার্কিন সংবাদদাতা হাজির হওয়ার সাথে সাথে গাড়িগুলো থেকে বাংলাদেশের সবুজ, লাল ও স্বর্ণালী পতাকা খুলে নেওয়া হয়।

এই সংবাদদাতা যখন এলাকার বাঙালি বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আজিম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চান ভারতীয় সৈনিক জানায় তিনি ঘাঁটিতে নেই। কিন্তু পরে বাঙালিদের সূত্রে জানা যায় তিনি সেখানেই ছিলেন।

বাঙালি সৈনিকরা বেদাইতে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুল কাটছে, খাবার কিনছে, পান চিবোচ্ছে, চা খাচ্ছে। প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণের শহর কলকাতায় যাওয়া–আসা করছিল বাংলাদেশের কতক গাড়ি।

কৃষ্ণনগর শহর থেকে কয়েক মাইল উত্তরে বর্তমান সংবাদদাতার ভাড়া–করা গাড়ির সঙ্গে বাংলাদেশের এক জিপের সামান্য সংঘর্ষ ঘটে। ই.পি.আর সৈন্যদের এই জিপ ও সঙ্গের ট্রাক বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জ্বালানি তেলের খালি ড্রাম এবং গোলা ও বিস্ফোরকের খালি বাক্স। গাড়ি দুটি সরবরাহ আনতে বেদাই থেকে কৃষ্ণনগর যাচ্ছিল।

এই রাস্তায় আজকেও যথেষ্ট ভারতীয় সামরিক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। সৈন্য বহনকারী ট্রাকবহর উত্তরের সীমান্তের দিকে এগিয়ে গেছে। উত্তর অভিমুখী একটি সামরিক ট্রাক, কাদা দিয়ে যার গায়ের চিহ্ন লেপ্টানো, কী বহন করে চলছিল বোঝা গেল না, কেননা পেছনের ত্রিপলের ঢাকনা নামানো ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে ভারতীয় বাহিনী তাদের অবস্থান শক্তিশালী করে চলেছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, সীমান্তের কাছাকাছি পাকবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতার কারণে এটা মামুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মাত্র।

ডেটলাইন : আগরতলা, ভারত
এপ্রিল ১৯৭১

যুদ্ধের নরক-যন্ত্রণা পোহাচ্ছে কেবল এক পক্ষই

সবাই বলে যুদ্ধ হচ্ছে নারকীয় ব্যাপার, তবে সাধারণত এই নরক-যন্ত্রণা যুদ্ধরত উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই সত্য।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তান আর্মি এবং সশস্ত্র শক্তিতে বহুলাংশে দুর্বল প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে তিন সপ্তাহের যুদ্ধে নরক সৃষ্টি হয়েছে কেবল একদিকেই—সেটা ঘটেছে হাজার হাজার পূর্ব পাকিস্তানি বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষেত্রে, বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্ত্রস্ত, ভীত ও দমন করার লক্ষ্যে পাক আর্মির গণহত্যার শিকার যাঁরা হয়েছেন।

প্রধান নগরী ও শহরগুলোর ওপর দখল কায়েমের পর সেনাবাহিনী, সম্পূর্ণত পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ে যা গঠিত এবং যাদের অনেকেই বাঙালিদের প্রতি তীব্র জাতিবিদ্বেষ পোষণ করে—এখন গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করছে। বর্ষা মৌসুমের আগেই তারা এই নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ করতে চাইছে। নতুবা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রবল ধারাবর্ষণ শুরু হয়ে নিয়মিত বাহিনীর চলাচল বিঘ্নিত করবে।

একজন বাঙালি অফিসার জানালেন, 'হাঁটুজলে হিমশিম খেয়ে ওরা ডুবে মরে। আমরা দেশী নৌকো ব্যবহার করবো। ওদের নাজেহাল করে ছাড়বো।'

আগামীতে এক দীর্ঘ ও বিষণ্ন যুদ্ধের শঙ্কা দেখা দিচ্ছে। বেশির ভাগ কূটনীতিক ও বিদেশী পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, প্রলম্বিত যুদ্ধ চালিয়ে বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের, যারা তাদের আবাস ও সরবরাহ কেন্দ্র থেকে হাজার মাইল দূরে রয়েছে।

তবে বৈদেশিক পর্যবেক্ষকরা এটাও মনে করেন যে, পাক সরকারের ওপর বিদেশী শক্তিসমূহ অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ না করলে

প্রদেশের ওপর শোষণের অবসান ঘটিয়ে ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। এই অর্থনৈতিক শোষণ থেকেই জন্ম নিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার তাগিদ।

প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক বিতর্ক, প্রত্যেক সংঘর্ষের সাধারণত থাকে দু'টি দিক। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে পাকবাহিনী যা করছে, তা প্রত্যক্ষ করার পর এর কোনোরকম যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এর কারণ, প্রাপ্ত সকল তথ্যপ্রমাণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, পাকবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস এবং সকল নেতা ও সম্ভাব্য নেতাকে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে অভিযানে নেমেছে।

একজন বাঙালি সৈনিক বললেন, 'তারা আমাদের এতোটা পাতালে টেনে নামাতে চায় যেন আমাদের ঘাস খেয়ে বাঁচতে হয়। তারা নিশ্চিত হতে চায় যেন তাদের বিরুদ্ধে আর কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস না পায়।'

বাঙালি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, সেনা অফিসার, প্রকৌশলী, ডাক্তার ও নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন অন্য সবাইকে পাক আর্মি হত্যা করছে।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবকাঠামো—খাদ্যগুদাম, চা বাগান, পাটকল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি ধ্বংসের জন্য পাকবাহিনী ব্যবহার করছে ট্যাঙ্ক, জঙ্গি বিমান, ভারি কামান ও গানবোট বহর। এসব অস্ত্রের বেশির ভাগই এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট চীন থেকে।

প্রতিরোধ বাহিনীর সবচেয়ে ভারি অস্ত্র হচ্ছে তিন ইঞ্চি মর্টার। সামান্য কতক ভারি কামান তারা দখল করেছে। বাঙালি সৈনিকদের কারো কারো পায়ে জুতো নেই। বাঙালিদের প্রতিরোধের মূল কেন্দ্র হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য, যাঁদের সংখ্যা ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ এবং আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এঁদের সবাই পাকবাহিনীর কাতার থেকে পালিয়ে এসেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে এমন পদক্ষেপের লক্ষ্য প্রধানত বাঙালিদের মনোবল অটুট রাখা এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধন করা।

অব্যাহত যুদ্ধের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই বৎসর মাঠে বের হয়ে ফসল বোনার ঝুঁকি নিচ্ছে না বাঙালি কৃষকেরা। পাটের রপ্তানি ঘটছে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরাটকায়বস্ত্রশিল্প তাদের নিম্নমানের উচ্চমূল্যের সুতি কাপড় পূর্ব পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করতে পারছে না। বাইরেও এর কোনো বাজার নেই।

একটি প্রশ্ন হচ্ছে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর অভিযান চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সাহায্য কমিউনিস্ট চীন পাকিস্তানকে দেবে কিনা। গত সপ্তাহে পাকিস্তান সরকারকে প্রেরিত এক নোটে চৌ এন লাই 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্যাপক হস্তক্ষেপের জন্য' যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের নিন্দাবাদ করেছেন এবং 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা আগ্রাসন শুরুর দুঃসাহস দেখালে' চীনের সমর্থনের

প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

এমনি আরেক প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমী সাহায্যদাতা গোষ্ঠী, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা পাকিস্তানকে বার্ষিক ১৭৫ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক রক্তপাত বন্ধ না করা পর্যন্ত সাহায্য স্থগিত রাখবে কিনা।

বিদেশ মন্ত্রণালয়ের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য চাপ দেওয়া, সে-সম্ভাবনা যতো সুদূরপরাহত হোক না কেন। এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কবলে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, চীনের প্রভাবের প্রাধান্য রোধ করতে যেখানে আমেরিকা একটি অবস্থান বজায় রাখতে চাইছে। তদুপরি রয়েছে মূলত পশ্চিমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনকারী পূর্ব পাকিস্তানের শুভেচ্ছা হারানোর বিপদ।

সরকারি বেতার মারফত পাকিস্তান সরকার যুদ্ধের প্রায় সকল কিছুর জন্য প্রায়শ ভারতকে অভিযুক্ত করছে। তাদের মতে, ভারতই স্বাধীনতাকামী বাহিনীকে অস্ত্র ও সৈন্য যোগাচ্ছে, পাকিস্তানি জাহাজকে উত্যক্ত করছে, গোপন বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং গণহত্যা ও বর্বরাচরণ বিষয়ে ফাঁপানো বিবরণ ছাপতে পত্রপত্রিকাকে উৎসাহিত করছে। এই সমস্ত অভিযোগ, যার সবই ভারত বারংবার অস্বীকার করেছে, বিশ্ব-সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা লাভ করেছে। এর প্রধান কারণ এইসব প্রচারের পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কোনো রেডিও বাংলাদেশের নেই।

স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভারত সম্ভবত সমর্থন সহায়তা যোগাচ্ছে, তবে অস্ত্র, গোলা ও সৈন্য দিয়ে সাহায্যের কোনো নজির এখনো মেলে নি।

ভারতকে যাবতীয় অপকর্মের জন্য দায়ী করা ছাড়াও রেডিও পাকিস্তান ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম পাকিস্তানি সংবাদপত্র পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক হয়ে আসছে' বলে দৈনিক ঘোষণা দিয়ে চলেছে। ব্যাপক জনসমর্থিত স্বাধীনতা আন্দোলনকে তারা 'কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কারসাজি' বলে অভিহিত করছে এবং বলছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠছে ও পাট রপ্তানি শুরু হয়েছে। এসবই নির্জলা মিথ্যা।

ডেটলাইন : পেট্রাপোল, ভারত
মে ১৬, ১৯৭১

পাকিস্তানি শরণার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ভারতের দরিদ্রজনের উষ্মার কারণ হয়েছে

পূর্ব পাকিস্তানে পাকবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য পলায়নপর বাঙালি শরণার্থীর বিপুল সংখ্যায় নিরন্তর আগমন কেবল ভারতের অর্থনীতি নয়, সামাজিক বাতাবরণের ওপরও প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে। শরণার্থী আগমনে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, অপরদিকে কমে গেছে মজুরি।

বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ভারত সরকার জানিয়েছে যে, শরণার্থীর সংখ্যা ২.৬ মিলিয়নে পৌঁছেছে—এদের মধ্যে দুই মিলিয়ন আশ্রয় নিয়েছে রাজনৈতিকভাবে বিস্ফোরণোন্মুখ জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রতিদিন আসছে আরো হাজার হাজার শরণার্থী।

বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ সরকার যে আশঙ্কা করে আসছেন দরিদ্র ভারতীয়দের মধ্যে তেমনি প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ ফুটে উঠছে এবং তাদের রুজি-রোজগারের জন্য উদ্বাস্তুরা প্রতিযোগিতা করে মজুরি নামিয়ে আনলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। সেই সাথে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গেছে, যেহেতু খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে দুই মাইলের মধ্যে এখানে পশ্চিম বাংলার এই শহরে ৫০০০ শরণার্থীর জন্য গড়ে তোলা তাঁবুর আশ্রয়স্থলে গিজগিজ করছে ১০,০০০ মানুষ। পেট্রাপোল যেখানে অবস্থিত সেই বনগাঁ জেলার জনসংখ্যা হচ্ছে ৩০০,০০০। কর্মকর্তারা বলেছেন, ইতিমধ্যে এই জেলায় ২৫০,০০০-এরও বেশি শরণার্থী এসেছে। খেতমজুরদের দৈনিক মজুরি ছিল তিন রুপি বা প্রায় ৪০ সেন্ট। এখন বাড়তি শ্রম

সরবরাহের ফলে মজুরি নেমে এসেছে দুই রুপিতে, কখনো কখনো এক রুপিতেও। অন্যান্য ধরনের কাজকর্মও একইভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

পেট্রাপোল ক্যাম্পের পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এস. আর. দাশ জানালেন, 'ক্যাম্পে যেহেতু শরণার্থীদের আহার যোগানোর ব্যবস্থা রয়েছে এবং খাবার কেনার জন্য টাকার দরকার নেই, তাই এইসব মানুষ যে কোনো মজুরিতে কাজ করতে প্রস্তুত। সরকার চায়, ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে কাজের বাজারে না গিয়ে শরণার্থীরা বরং শিবিরের ভেতরে অবস্থান করুক। কিন্তু এটা বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, 'এই সমস্যা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।'

কী করার রয়েছে ?

মি. দাশ বলেন, স্থানীয় জনসাধারণ শরণার্থীদের নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, কিন্তু এক্ষেত্রে কীই–বা করার রয়েছে? অন্যান্য কর্মকর্তা ব্যক্তিগত জীবনের ওপর চাপের উদাহরণ দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার কথা জানিয়েছেন। শরণার্থীদের আশ্রয়দানের জন্য বহু বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়াতে অস্থির হয়ে উঠছেন ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দ। কোনো কোনো ভারতীয়ের অভিযোগ যে, তাঁদের চাইতে ভালো খাবার জুটছে শরণার্থীদের।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ১৩৫০ মাইল সীমান্ত ঘেঁষে যে তিনশতাধিক আশ্রয় শিবির গড়ে উঠেছে তার অনেকগুলোর তুলনায় এই শিবির আদর্শস্থানীয় হলেও সুষ্ঠু ও প্রয়োজনীয় অনেক ব্যবস্থাই এখানে নেই। পায়খানার সংখ্যাল্পতা এবং যথাযথ আব্রুর অভাবের দরুন মাঠ জুড়ে দূষণ সমস্যা সৃষ্টি করছে শরণার্থীরা। জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়েছে সর্বত্র।

কলেরার ইনজেকশন

শরণার্থীদের কলেরার ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। পেট্রাপোলে নয় অন্যত্র ক্যাম্পে কলেরার বিস্তার ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে পেট্রাপোল ক্যাম্প হাসপাতালের অধিকাংশ রোগী আমাশা–পীড়িত। শিবিরের লাউড স্পিকার থেকে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশমালার অনবরত উদ্‌গারণ চলছে, আশ্রিতদের বিভ্রান্তি তাতে বাড়ছে বলেই মনে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনকল্পে ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরুর পর থেকে ভারত এককভাবে শরণার্থী সমস্যা মোকাবেলায় তার অপারগতার কথা জানিয়ে আসছে। এজন্য বিদেশী সহায়তার আবেদন জানিয়ে এলেও আজ পর্যন্ত সাহায্য মিলেছে সামান্যই।

শরণার্থীদের দায়িত্ব যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই দাবির পক্ষে যুক্তি পেশকালে ভারত ১.৪ মিলিয়ন প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুর কথা তুলে ধরেছে জাতিসংঘ যাদের তদারকি করছে। ভারতে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা ইতিমধ্যে ঐ সংখ্যা ছাপিয়ে গেছে। ভারতীয় কর্মকর্তাদের হিসেবে অনুযায়ী শরণার্থীদের সংখ্যা ১০ মিলিয়নে পৌঁছুতে পারে এবং এ–

বাবদ বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াবে কোটি কোটি ডলার।

গতকাল এক কূটনীতিক–পত্রে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে তারা উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সন্ত্রাস অভিযান চালাচ্ছে। ভারত জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেছে, 'উদ্বাস্তুদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের যথোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে পাকিস্তান প্রশ্নাতীতভাবে বাধ্য।' পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, 'উদ্বাস্তুদের আশ্রয়দানের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পাকিস্তানের ওপর বর্তায়।'

শরণার্থী শিবিরসমূহে দুইদিনের সফরের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আজ বিকেলে পেট্রাপোল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। বাংলাভাষী শরণার্থীদের কাছে বোধগম্য হিন্দী ভাষায় কথোপকথনকালে তিনি তাঁদের বলেন, 'আপনারা এখানে এসেছেন নিঃস্ব ও ক্ষুধার্ত, সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে। ভারত স্বয়ং অতি দরিদ্র দেশ, তা সত্ত্বেও আমরা যথাসম্ভব আপনাদের সহায়তা দান করবো এবং আবার ঘরে ফিরে যেতে আপনাদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।'

ডেটলাইন : দিল্লি, ভারত
মে ২১, ১৯৭১

ভারতে বাঙালি শরণার্থীদের দুর্দশা

পূর্ব পাকিস্তান ঘিরে ভারতের ১৩৫০ মাইল দীর্ঘ সীমান্তের চেহারা দাঁড়িয়েছে এক অন্তহীন ও চরম দুর্দশাগ্রস্ত জিপসি ক্যাম্পের মতো। পাকবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছে ভীত ও হতবিহ্বল মানুষের বিরাট ঢেউ—ভারত বলছে এই সংখ্যা তিন মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকায় প্রতিদিন আরো হাজার হাজার মানুষ ভারতে আসছে।

অর্ধেকের মতো শরণার্থীর জন্য ভারত বাস-সংস্থান করেছে বিশ্রীভাবে জনবহুল ক্যাম্পগুলোতে, স্কুল ও ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করে ঝটিতি এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অন্যরা থাকছেন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে।

নতুন শিবিরে যাওয়ার অপেক্ষায় পথের ধারে পড়ে রয়েছেন আরো ব্যাপক সংখ্যক মানুষ—কোনোরকমে আচ্ছাদন তাঁরা দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন, অথবা থাকছেন খোলা আকাশের নিচে, মৌসুমি বর্ষণের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়হীনভাবে, যে বর্ষণ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

রাস্তার ধারে রাখা পয়ঃনিষ্কাশনের বিশালাকার কংক্রিটের পাইপ হয়েছে কারো কারো আশ্রয়স্থল। কোনো রাস্তায় দেখা যায় একদা-সচ্ছল বাঙালি ভিক্ষা করছেন।

প্রতিদিন ব্যাপকসংখ্যক শরণার্থীর আগমনে পরিস্থিতি সামাল দেয়া ভারতের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে উঠেছে, যে-দেশটির সম্পদের ওপর ইতিমধ্যেই চাপ পড়েছে। তবে ভারত যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে।

শিবিরের স্বাস্থ্য সমস্যা গুরুতর। খোলা জায়গায় মলমূত্র-ত্যাগ সাধারণ ঘটনা। কতক স্থানে ইতিমধ্যেই কলেরা রোগ-সংক্রমণ

ঘটেছে। আমাশয় ও অন্যান্য আন্ত্রিক রোগ বেশ ব্যাপক।

এমন কি যেসব শিবিরে প্রাথমিক পয়ঃসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানকার অবস্থাও হতদ্দশায় পতিত মানুষের গিজগিজে ভিড়ে। কোনো কোনো শিবিরে সবসময় বাতাসে ভাসছে তীব্র কটু গন্ধ এবং ময়লা ফেলা হচ্ছে যত্রতত্র।

এই সপ্তাহে ভারত সরকার আয়োজিত তিনদিনব্যাপী সাংবাদিক সফরকালে শরণার্থীদের অবস্থা দেখে বোঝা গেছে যে, গত নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের বদ্বীপ এলাকায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং দুই মিলিয়নের নিরাশ্রয় ও ক্ষুধার্ত হওয়ার ঘটনা থেকেও মানবিক মাপকাঠিতে অধিকতর ধ্বংসাত্মক হয়েছে পাকবাহিনীর সামরিক অভিযান। মানুষের দুর্গতির পরিমাপ অথবা তুলনা করা যদিও একটা কঠিন কাজ, তবুও ঘূর্ণিঝড় থেকে বেঁচে–যাওয়া মানুষের তুলনায় বিমূঢ় শরণার্থীদের মনে হয় মানসিকভাবে আরো ভেঙে–পড়া। কেননা যুগ যুগ ধরে তাঁরা যা করে এসেছে, দুর্গতির জন্য এবার তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে পারছে না। তাঁরা দোষ দিচ্ছে 'পাঞ্জাবিদের'—পাকিস্তানি বাহিনী প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবিদের নিয়ে গঠিত। যেহেতু এই দুর্গতি মানব–সৃষ্ট, তাই এর মোকাবেলায় তাঁরা যেন তত সক্ষম নন।

বৈদেশিক সহায়তা নেই

নিজ ভূমিতে বসবাসের নিরাপত্তা–অনুভব তাঁদের নেই। নেই বিপুল বৈদেশিক সাহায্য—ঘূর্ণিঝড়ের পর যেমনটা ঘটেছিল।

কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে আছেন এক মাসের ওপর, তারপরও তাঁদের ভয় কাটে নি। প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের পরিবারের সদস্য, নিকটাত্মীয় অথবা বন্ধুজনদের হারিয়েছেন এবং অনেকেই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। অনেককেই দেখাচ্ছে বৃদ্ধ–আবাসের নিঃশক্তি বুড়োর মতো, শূন্য দৃষ্টি নিয়ে এলোমেলো ঘুরে ফিরছে। অন্যেরা ডুকরে কেঁদে উঠছে যখনই ভাবছে তাঁদের ওপর দিয়ে কী দুর্ভাগ্যই–না বয়ে গেছে। শিশুদের মধ্যে নেই প্রাণবন্ততা।

ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর কোণে সাব্রুমের শরণার্থী শিবিরে ৪৫ বৎসরের এক মহিলা, যাঁকে দেখাচ্ছিল থুত্থুড়ে বৃদ্ধার মতো, সাংবাদিকদের পিছে পিছে ফিরছিলেন তাঁর ১৬ বৎসরের যমজ কন্যাদের খুঁজে দেওয়ার জন্য। তিনি বিড়বিড় করছিলেন এবং মনে হচ্ছিল যেন কোনো মানসিক বিপর্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। তিনি জানালেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল এবং সবাই বেরিয়ে এলে সৈন্যরা দুই কন্যাকে ধরে টেনে নিয়ে যায়।

বাঙালিদের অনেকেই বলছেন তাঁদের শহর–গ্রাম বসবাসের জন্য নিরাপদ হয়ে উটলে তাঁরা ফিরে যাবেন। কোনো প্রত্যয় ছাড়াই তাঁরা বলছেন যে এটা শিগ্‌গিরই ঘটবে।

সাব্রুম থেকে কয়েক মাইল দূরে ১২,০০০ শরণার্থী ওপচানো ক্যাম্পে দেড় বছরের একটি শিশু, তার বয়সের তুলনায় ক্ষুদে, দৃশ্যত অপুষ্টিতে ভুগছে, উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে যেতে চেষ্টা করছিল বেড়ার ঘরের দিকে, যেখানে অন্য কতক পরিবারের সঙ্গে তার বাবা–মাও

রয়েছে। শরীরে কোনো শক্তি না থাকায় শিশুটি, ছোট মুখবিবরে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে, দুলতে দুলতে পড়ে গেল। সে হামাগুড়িও দিতে পারছিল না।

ভিড়াক্রান্ত হাসপাতাল

এমনি সমস্যার কারণে সীমান্তবর্তী শহরগুলোর ভারতীয় হাসপাতাল রোগীর ভিড়ে উপচে পড়ছে। এদের অনেকেই গুলিতে আহত।

আগরতলায় ২৬০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি হাসপাতালে বুধবার দিন ছিল ৫৪০ জন রোগী, এর মধ্যে প্রায় ১০০ জনের রয়েছে বুলেটের ক্ষত। এক ডাক্তার জানালেন, আগের দিন এমনি আঘাত নিয়ে প্রায় ৪০ জন রোগী এসেছিল।

আহতদের মধ্যে মাত্র সামান্য ক'জনই বাঙালি স্বাধীনতা বাহিনীর সদস্য, সীমান্তে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে প্রায়শ যাঁদের সংঘর্ষ ঘটছে। বাদবাকি সবাই বেসামরিক নাগরিক, স্পষ্টতই যাঁরা নিরস্ত্র এবংপ্রায় ক্ষেত্রে পালানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কতক শিশুও রয়েছে।

তিন মাসের এক বাচ্চার উরুদেশে গুলি লেগেছে। সন্তানসম্ভবা এক নারী তলপেটে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ১১ বছরের এক বালক হাঁটুর পেছনে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। ডাক্তার জানালেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আহতরা হচ্ছে পুরুষ, কারণ নারী ও শিশুদের পথেই মৃত্যু ঘটছে।

হাসপাতাল একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার এবং বেশ দক্ষভাবে পরিচালিত বলেই মনে হয়। তবে শয্যার অভাবে অনেক রোগীকেই মাটিতে বিছানা পাততে হয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে আগত ১৭ বৎসরের হিন্দু ছাত্র সুবলকান্তি নাথ, যাঁর ডান হাত ঝরঝরে হয়ে গেছে, আমাদের জানালেন যে, কোনোরকম হুশিয়ারি ছাড়াই ৪০০ সৈন্য ৫০টি হিন্দু পরিবার অধ্যুষিত তাঁদের মহল্লা ঘিরে ফেলে। মেশিনগান বসানো জিপ ও ট্যাঙ্কও ছিল কিছু। এবং মিলিটারিরা হঠাৎ গুলি ছুঁড়তে শুরু করে।

তিনি বলেন, গোলাগুলির ফলে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাড়ির পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে পালাতে সমর্থ হন। পরিবারের অন্যদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তিনি জানেন না।

অনেক হিন্দুর মতো তিনিও পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান না, প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে তিনি স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে নিতে চান। সীমান্ত পেরিয়ে মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি সংখ্যায় পালাচ্ছে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরা, যাঁরা হয়ে উঠেছে পাঞ্জাবিদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু।

৭৫ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানির মধ্যে ১০ মিলিয়ন হিন্দু হচ্ছে আওয়ামী লীগের কড়া সমর্থকদের অংশ। হিন্দুরা যদিও এখনো আন্দোলনের আদর্শ নিয়ে উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের হটাবার কোনো আশু সম্ভাবনা তাঁরা দেখছেন না।

'আমরা জানি না কী করতে হবে'

'আমরা অসহায়, জানি না কী করতে হবে', বলেছেন নিয়তি রানী চৌধুরী, ২০ বৎসর বয়স্ক

এই কলেজ-ছাত্রী জানিয়েছেন যে সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষণ ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগের দৃশ্য দেখে তিনি ও তাঁর পরিবার পালিয়ে এসেছেন। ধর্ষণের কথা বলতে গিয়ে বিব্রত হয়ে মাথা ঝুঁকে এলো তাঁর।

ভারত সরকার আশাবাদিতার সঙ্গে বলছে যে, শরণার্থীরা ছয় মাসের ভেতর দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু পাকবাহিনীর অব্যাহত তৎপরতা ও গেরিলা প্রতি-আক্রমণের প্রেক্ষিতে ভারতীয় কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মত ব্যক্ত করেন যে, এমন আশা করাটা ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার।

বস্তুত সরকার এখন অনুমান করছে শেষ পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা ছয় মিলিয়নে দাঁড়াতে পারে। এমনকি এটাও একটা আনুমানিক হিসেব মাত্র। কোনো কোনো কর্মকর্তা মনে করেন শরণার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

কোনো কোনো আশ্রয়শিবিরে সীমান্তের ওপার থেকে মর্টার ও কামানের গোলা ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। শেল এবং টুকরো অংশ কখনো কখনো ভারতে এসে পড়ে। কয়েকজন ভারতীয় ও শরণার্থী এতে হতাহত হয়েছেন।

সাব্রুমের একটি শরণার্থী শিবির থেকে ১০০ গজের মধ্যে পাকবাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে। তাদের ফারাক করে রেখেছে ফেনী নদী, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানা, যে নদীতে সাঁতার কেটে বেড়ায় বাঙালিদের অনেকে।

যুদ্ধে যোগদানের পরিকল্পনা

শরণার্থীদের কেউ কেউ জানান বাংলাদেশের জন্য লড়তে তাঁরা স্বাধীনতা বাহিনীতে যোগ দেবেন। তবে শিবিরে বিরাজমান রাজনৈতিক মনোভাব সম্পর্কে সাধারণীকরণ করা মুশকিল।

অন্যান্য অনেকে—কায়ক্লেশে দিন গুজরানকারী গরিব কৃষক অথবা সুবিন্যস্ত জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আমলা—রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন না। কারো কারো এখনও কোনো আগ্রহ নেই এবং লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার কোনো উদ্যম তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না।

একটি বড় কারখানার প্রধান হিসাবরক্ষক ছিলেন এমন একজন হিন্দু বললেন, 'আমার পরিবার রয়েছে। সেটাই হচ্ছে বড় সমস্যা।'

অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি-বিমুখ ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন রাজনীতি-সচেতন।

৩২ বৎসরের মুসলিম শিক্ষক খালেদ হোসেন পায়ে আঘাত পেয়েছেন এবং আগরতলা হাসপাতালে এখন নিরাময়ের পথে। তিনি খোলাখুলি না বললেও আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়েছেন গত ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে তিনি ভোট দেন নি। এখন একজন জঙ্গি স্বাধীনতা সংগ্রামীর মতো শোনাচ্ছে তাঁর কথাবার্তা। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে কি করবেন জিগ্যেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, 'আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করবো।'

ডেটলাইন : বারাসাত, ভারত
জুন ১৬, ১৯৭১

হতাশার ট্রেনে চেপে চলছে বাঙালি শরণার্থী দল

১২টি বগিতে হাজারের কমসংখ্যক যাত্রীর ঠাঁই হয় এমন একটি ট্রেনে চড়েছে দুই হাজার হতশ্রী বাঙালি শরণার্থী। আরো পাঁচ হাজার মানুষ শুয়ে-বসে রয়েছে প্ল্যাটফর্মে, অপেক্ষা করছে তাঁদের পালা আসার—যদিও ২৪ ঘণ্টার আগে পরের ট্রেনটি আসছে না।

অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মৃত্যু ঘটছে কারো কারো—অপুষ্টি, নিউমোনিয়া, উদরাময় ও কলেরায়। মধ্য ভারতের যে-জায়গায় তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে সবাই চিন্তিত ও ভীত। পূর্ব পাকিস্তানে বাধ্যত ফেলে আসা বাড়িঘরের কাছাকাছি থাকতে পারাটাতেই তাঁরা বরং আগ্রহী।

কিন্তু মরিয়া হয়ে ওঠা ভারতীয় সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের রেশন বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে,—তাঁরা জানে এভাবে যদি বাধ্য না করা হয় তবে অসম্ভব রকম ওপচানো সীমান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে তাঁদের ভারতের অন্যত্র নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। সরকারি রেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খাবার কেনার জন্য শরণার্থীরা বেচে দিয়েছে তাঁদের যৎসামান্য সম্বল—ছাতা, থালাবাসন, কাপড়-চোপড়।

দ্বিগুণ জনসংখ্যা

দৃশ্যটির স্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বারাসাত, কলকাতা থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পূর্বে এবং পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ৩০ মাইল ভেতরে। একসময় এলাকার লোকসংখ্যা ছিল ৪০,০০০। এখন এখানে উপচে পড়েছে আরো ৪০,০০০ মানুষ, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য পাকসেনাভিযান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে এঁরা। ভারতের সীমান্ত এলাকা জুড়ে

প্রায় ষাট লক্ষ ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ শরণার্থীর ভিড়ে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার একটি অনুচিত্র হচ্ছে বারাসাত।

মোট শরণার্থীর মধ্যে মাত্র ৩০০০ জনকে সরকার ইতিমধ্যে স্থানান্তর করতে পেরেছে ২৬০০ মাইল দূরে মধ্যপ্রদেশের মানার অস্থায়ী শিবিরে। তাঁদের প্রায় সবাইকে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল থেকে দুইটি সোভিয়েত বিমানে করেও এই কাজ শুরু হয়েছে। বিমানে প্রতিদিন ৭০০ উদ্বাস্তুকে মানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগামীকাল থেকে চারটি পরিবহন বিমান নিয়ে আমেরিকান বহর কাজ শুরু করবে এবং আশা করা যাচ্ছে ত্রিপুরা ও আসাম থেকে এভাবে দৈনিক ১০০০ শরণার্থীকে সরিয়ে নেওয়া যাবে।

এখনও আসছে শরণার্থী

তবে এমনি হারে শরণার্থী স্থানান্তরের কাজ চললে তা নতুন শরণার্থী আগমনের সঙ্গে তাল বজায় রাখতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রতিদিনই আসছে হাজার হাজার উদ্বাস্তু।

উদাহরণত, বারাসাত শহরে এখন প্রতিদিন ৫০০০ শরণার্থী এসে পৌছুচ্ছে এবং ট্রেনে চলে যাচ্ছে ২০০০ শরণার্থী। স্থানীয় কর্মকর্তারা নতুন কোনো শরণার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাঁদের পার্শ্ববর্তী জেলায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আজকের বারাসাতকে শহর বলা চলে না, হয়ে উঠেছে মৌমাছির ঝাঁক। রাস্তায় উদ্বাস্তুর এমন ভিড় যে গাড়ি নিয়ে এগোতে হয় মেপে মেপে। প্রতিটি সদর দরজার সামনে, বারান্দায়, খালি বাড়িতে শরণার্থী উপচে পড়ছে। সব খোলা মাঠ তাঁরা ভরে ফেলেছে। সবখানেই দেখা যাবে খড়কুটো দিয়ে জ্বালানো তাঁদের চুল্লি, জোড়াতালি দিয়ে গড়ে তোলা সাময়িক আচ্ছাদন—বৃষ্টির ধারাপাত যা সহজেই ফুটো করে ফেলে। মৌসুমি বর্ষণ যতো বাড়ছে চারপাশের কাদা ও ময়লা আবর্জনা ততই থকথকে হয়ে উঠছে।

স্থানীয় জনসাধারণ সহানুভূতিপ্রবণ। তবে সব ধরনের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ শরণার্থীরা যেভাবে রুদ্ধ করছে তাতে করে স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়ছে। গত সপ্তাহে অবিরাম বর্ষণ থেকে বাঁচার জন্য হিন্দু শরণার্থীরা প্রবেশ করেছিল মুসলমানদের মসজিদে এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেঁধে যাওয়া রোধ করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছিল প্রশাসনকে। এমনি হাঙ্গামাকে খুব ভয় পাচ্ছে ভারত সরকার।

'এদিক থেকে কোনো সমাধান নেই'

'যদি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো রাজনৈতিক সুরাহা না ঘটে,' বললেন তারকনাথ ভট্টাচার্য, ৩৫ বছর বয়েসী জেলা প্রশাসক, 'আমাদের এদিক থেকে কোনো সমাধান করা যাবে না।'

শহরের অবস্থা যেমন করুণ, রেলসার্ভিসের পরিস্থিতি ততোধিক। টিমটিমে বাতির আলোয় রেলস্টেশনের শানবাঁধানো স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে গাদাগাদি করে শুয়ে থাকা ৫০০০ শরণার্থীকে মনে হচ্ছে যেন মৃত্যুর চাদরে আবৃত নিথর সত্তা। এক সময় সেই জড়পিণ্ড যেন সামান্য নড়েচড়ে ওঠে। কেউ হয়তো একটি হাত অথবা পা নাড়ালো, কেউ বমি করে উঠলো, কারো গোঙানির শব্দ, একটি বাচ্চা তারস্বরে কাঁদছে।

মেঝেতে হাত–পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে এক বৃদ্ধ, ঘোর–লাগা দৃষ্টি, মৃত্যুপথযাত্রী। হাড়জিরজিরে মাছিতাড়িত শিশু হামাগুড়ি দিতে গিয়ে একটু সরে গেছে পরিবারের কাছ থেকে। বাবা–মার অনুপস্থিতি টের পেয়ে হঠাৎ–জাগা কান্নার সঙ্গে দমকে উঠতে থাকে কাশি। সচকিত হয়ে জেগে উঠলেও বাবা–মা এতোই ক্ষীণশক্তি ও ঘোরাচ্ছন্ন যে সাহায্যের কোনো হাত বাড়িয়ে দিতে পারছে না। পূর্ব পাকিস্তানের বাড়িঘর ছেড়ে এই দীর্ঘ পদযাত্রায় শরণার্থীরা একেবারেই শক্তিহীন। অনেকেরই উঠে প্রয়োজনীয় কর্ম সারবার শক্তিও নেই। মাঝে মাঝে ক্ষীণ বাতাসের দোলা বয়ে আনছে দুর্গন্ধ। গোটা স্টেশনে কোনো ডাক্তার–নার্স বা প্রাথমিক চিকিৎসা–সহযোগী নেই।

একটি ছোট টিনের তোরঙ্গ, যার ভেতরে রয়েছে তার যথাসর্বস্ব, সেটা খুলে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছেন এক হতবুদ্ধি ব্যক্তি। বারবার আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখে নিচ্ছিলেন তাঁর প্রতিটি জীর্ণ দলিলপত্র ও মলিন জামাকাপড়।

স্টেশন মাস্টার বলছিলেন যে, কলকাতা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনের এই একই দুর্গতি। তিনি জানালেন, প্ল্যাটফর্মেই প্রতিদিন চার–পাঁচজন কলেরায় মারা যাচ্ছে।

বিকেল পাঁচটা থেকে শরণার্থীরা ট্রেনে চেপে বসে আছে। রাত বারোটা চার মিনিটে এটা যাত্রা শুরু করবে। ভেতরে গাদাগাদি যাত্রীর ভিড়ে বাতাস গুমোট হয়ে আছে। সময়সূচি অনুযায়ী মানা পৌঁছুতে সময় লাগবে ২২ ঘণ্টা, কিন্তু বারংবার যাত্রাভঙ্গ ও বিলম্বের কারণে প্রকৃতপক্ষে সময় লাগবে আরো বেশি। ভেতরের বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে যাত্রীদের কেউ কেউ বাইরে বেরিয়ে আসছেন, কিন্তু এখানকার বাতাসও প্রায় একইরকমের গুমোট।

গন্তব্যস্থান নিয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা খুঁজছেন এমন লোক যে জবাব দিতে পারবে তাঁদের জিজ্ঞাসার—'মানাতে কি আমাদের খাবারদাবার মিলবে ?'

'ওখানে ওঁরা কি জানে যে আমরা আসছি ?'

স্টেশনে কর্মচারীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাঁদের উত্তরও খুব ভাসাভাসা।

'পৃথিবীতে যদি সত্যের কোনো শক্তি থেকে থাকে তবে আমরা স্বাধীনতা পাবো বলে আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি', বললেন ২১ বছরের দোকানদার আশুতোষ বিশ্বাস। তারপর সামান্য ভেবে তিনি যোগ করলেন, 'আমরা বড়রা দুর্গতি ভোগ করার জন্য তৈরি রয়েছি কিন্তু আমাদের শিশুদের কেন হত্যা করা হচ্ছে ? কীভাবে আমরা ঐসব জীবন আবার ফিরিয়ে দিতে পারি ?'

কয়েক মিনিট পর হুইসিল বাজিয়ে ট্রেন যখন ধীরে ধীরে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ, পরের ট্রেনে যাঁর যাবার কথা, বিড়বিড় করে বললেন, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, 'যাত্রাপথেই মারা যাবে এদের অনেকে।'

ডেটলাইন : ঢাকা
জুন ২৫, ১৯৭১

সেনাভিযানের তিন মাস পরও ঢাকা ভীতসন্ত্রস্ত

নাগরিকজনেরা বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলে চাপা স্বরে এবং পেছন দিকে লক্ষ্য রাখে পাছে কেউ কিছু শুনে ফেলে কিনা। সৈনিক ও বিশেষ পুলিশ দল—যাদের নিয়ে আসা হয়েছে হাজার মাইলেরও দূরের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে—রাস্তায় গাড়ি, বাস ও বোঝা–হাতে মানুষজন থামিয়ে খানাতল্লাশি চালাচ্ছে।

আটক ও গ্রেপ্তারি অব্যাহত রয়েছে, যদিও তা কখনো স্বীকার করা হয় না। পরিবারের লোকজন যখন সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চায় তাঁদের পুত্র বা পিতার খবরাখবর, সামরিক কর্তাদের বাঁধা জবাব হচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও যদি বাড়ি না ফিরে থাকে তবে হয়তো ভারতে পালিয়ে গেছে। ধরা পড়লে কঠোর সাজার ভয় সত্ত্বেও বহু লোক প্রতিদিন সংগুপ্ত বাংলাদেশ বেতার শুনে থাকে। প্রদেশব্যাপী বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর অভিযানের তিন মাস পর এই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার অস্বস্তিকর ও অসুখী পরিস্থিতি। শহরের নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে সৈন্যবাহিনীর হাতে, তবে 'স্বাভাবিকতা'—পরিস্থিতি বয়ানকালে যে কথাটা সরকার ব্যবহার করে—তার কোনো অস্তিত্ব নেই। আজকের ঢাকাকে বড় জোর বলা যেতে পারে সেনাবাহিনী অধিকৃত নগরী, যেখানে শক্তি, সন্ত্রাস ও ভীতির শাসন চলছে, কিন্তু কোনোভাবেই কার্যকর বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।

ঢাকার ১৫ লক্ষ মানুষের মাত্র অর্ধেক এখানে রয়েছে। বাদবাকিদের অধিকাংশই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অথবা ভারতে পালিয়ে গেছে। বহু সহস্র নাগরিক, সঠিক সংখ্যা

কেউ জানেন না, নিহত হয়েছেন সেনাবাহিনীর হাতে।

অল্প অল্প করে মানুষ যদিও ফিরে আসছে, তবুও অনেক দোকানপাট এখনো বন্ধ। যেসব দোকান খুলেছে তার বেশিরভাগই আবার সামরিক বাহিনী ও তার দোসর লোকজনের লুট বা হাঙ্গামার ভয়ে বেলা থাকতেই বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় জনচলাচল কম। ব্যস্ত সময়ে একদা যেসব পথ জনাকীর্ণ থাকতো, পুরনো ঢাকার সেইসব সরু রাস্তা দিয়ে এখন গাড়ি নিয়ে অনায়াসে ঘোরা যায়। আগের দিনে ভিড়ের জন্য এখানে হয়তো ঘণ্টাখানেক আটকা পড়ে থাকতে হতো।

২৫ মার্চ সেনাভিযান শুরুর পর চলতি সপ্তাহে এই প্রথমবারের মতো সরকার বিদেশী সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তানে আসা ও স্বাধীনভাবে ঘুরবার অনুমতি দিয়েছে।

ট্যাঙ্ক, রকেট ও অন্যান্য ভারি অস্ত্র ব্যবহার করে যেসব ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানো হয়েছিল তার অনেক চিহ্নই মুছে ফেলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই ঝড়ের বহু নিদর্শনই রয়ে গেছে। এখানে অবস্থানরত বিদেশীরা মাটিতে মিশিয়ে দেয়া শহরের সেইসব ধ্বংসস্তূপের ব্যঙ্গাত্মক নামকরণ করেছে 'পাঞ্জাবি নগর–উন্নয়ন প্রয়াস'— সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি বা পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্যের প্রতি ইঙ্গিতবহ এই মন্তব্য।

বেশির ভাগ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে শহরের পুরনো এলাকায়, ঢাকার দরিদ্রজনদের যেখানে বসবাস। তাঁরা আওয়ামী লীগের দৃঢ় সমর্থক, যে দল গত ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বশাসনের দাবি নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দলটি এখন নিষিদ্ধ।

পাড়ার পর পাড়া, যা ছিল একদা টিনের চালার নড়বড়ে ঘরের সারি, এখন সেখানে কেবল শূন্যতা, ধূলিধূসর লম্বা মাঠ। এখানেওখানে ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের স্তূপ শুধু জানান দিচ্ছে অতীতে কি ছিল এখানে। ইট–সিমেন্টের তৈরি কিছু কিছু ভবন, যেগুলোর ক্ষতির মাত্রা মেরামতের অযোগ্য, তা ভেঙে ফেলে সরকার ধ্বংসযজ্ঞের যাবতীয় নিদর্শন মুছে দিতে চাইছে।

বস্তুত মুখশ্রী উন্নত করার জন্য কর্মকর্তারা বেশ বড় ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে। দগ্ধ মাটিতে জমে থাকা যাবতীয় আবর্জনা বুলডোজার দিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আশপাশের যেসব বাড়িঘরে বুলেট ও গোলাবর্ষণের গর্ত রয়ে গিয়েছিল সেগুলো ভরাট করে তার ওপর চুনকাম করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঙালি পুলিশদের ব্যারাক, সেনাবাহিনীর আক্রমণের এই দুই বিশেষ লক্ষ্যস্থানেও মেরামত ও চুনকামের ছাপ রয়েছে। কিন্তু একতলা সারি সারি সুদীর্ঘ পুলিশ ব্যারাকগুলোর অবস্থানটা এখনও দেখাচ্ছে আক্রমণের পরের সকালের মতো, ভারি গোলায় ধ্বংস ও দগ্ধ করে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া। সেনাভিযানে নিহত হয়েছে আনুমানিক প্রায় ৭০০ বাঙালি পুলিশ।

পুরনো ঢাকার কিছু কিছু দগ্ধ এলাকায় সরকার ইটের নতুন ঘর তুলে ব্যবসায়ীদের কাছে দোকান হিসেবে ইজারা দিচ্ছে। পাইকারি কেনাবেচার এমনি একটি ভস্মীভূত এলাকায় পুরনো মালিকেরা নিজেরাই আবার দোকান তুলে নিচ্ছে।

আর সব জায়গার মতো এখানেও পরিবেশ হচ্ছে ভীতিতাড়িত। সৈন্যদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে কোনো কোনো দোকানদার কাচের ওপর বড় করে সেঁটে রেখেছে বাণী—'ক্র্যাশ ইন্ডিয়া'। সবখানেই উড়ছে পাকিস্তানের পতাকা।

রাস্তায় খোলাখুলি কথা বলবে খুব কম লোকই, কিন্তু বিদেশী দর্শনার্থীদের গাড়ি যখন ধার ঘেঁষে চলবে জানালার কাছে মুখ এনে ওরা ফিসফিসিয়ে বলবে অনেক কথা। 'এখানে সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল', এক বৃদ্ধ বললেন মুখ প্রায় না খুলে।

অনেক হিন্দু দোকান মালিক, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মিষ্টি বিক্রেতা, হয় পালিয়ে গেছেন নতুবা নিহত হয়েছেন। অবাঙালি মুসলমান ও সেনাবাহিনীর পক্ষাবলম্বী লোকজনদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের দোকান।

হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠরা বিশেষভাবে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বহুকাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃত্ববানরা হিন্দুদের বিবেচনা করে আসছে অবিশ্বস্ত, যাঁদের প্রকৃত আনুগত্য রয়েছে, তাদের মতে, মূলত হিন্দু অধ্যুষিত ভারতের প্রতি। যে ছয় লক্ষ পূর্ব পাকিস্তানি ভারতে পালিয়ে গেছে তাঁদের ভেতর চার লক্ষ বা ততোধিক হচ্ছে হিন্দু।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলছে। এখানে উপাসনা করার মতো হিন্দু লোকজন রয়েছে কিনা সেসব কিছুই বিবেচনা করছে না। হিন্দু অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম যাঁরাই পালিয়ে গেছে তাঁদের বাড়িঘর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'অনুগত' নাগরিকদের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘর থেকে বের করে এমনি দখলদারি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতি দমন-অভিযানের অংশ হিসেবে গাড়ির নম্বর-প্লেট বাংলা থেকে আবার ইংরেজিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। রাস্তায় সৈনিক খুব বেশি নজরে পড়ে না। কিন্তু রয়েছে তাদের বিকল্প—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা পুলিশ, ছাইরঙা কোর্তা ও টুপি-পরা। তাদের বড় কাজ হলো ঘরে তৈরি বোমা ও অস্ত্রপাতির খোঁজে রাস্তায় গাড়িঘোড়া তল্লাশি করা।

ঢাকায় বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা বোমা নিক্ষেপ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে এসব এখনো বিক্ষিপ্ত এবং সুসংগঠিত নয়। বাঙালিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নেওয়া ও পরে হত্যা করা সম্পর্কে নানা খবর শহরময় চালাচালি হচ্ছে। এখানে বসবাসরত বিদেশীরা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করলেও অধিকাংশ খবর প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা কঠিন। তবে কিছু কিছু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য বিবরণী রয়েছে।

একজন ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও তাঁর গোটা পরিবারকে সম্প্রতি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আর্মি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কেবল একটি ছেলে ছাড়া পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেলেটির কি হয়েছে এ-খবর আর তাঁরা জানতে পারেন নি। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ সেটাও জানা যায় নি।

'এখন আপনি নিজের চোখেই সবকিছু দেখতে পারবেন', শহরকেন্দ্রের দোকানে এক বাঙালি যুবক ফিসফিস করে বললো বিদেশী সংবাদদাতাকে। 'ওরা কি করেছে এবার আপনি সব দেখতে পাবেন। আমি একজন হিন্দু কিন্তু এখন নাম পাল্টে খৃস্টান হয়েছি এবং আমার পরিবারকে খৃস্টান বাড়িতে নিয়ে তুলেছি। আপনারা যে এসেছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি আমাদের সাহায্য করতে আপনারা সফলকাম হোন।'

ডেটলাইন : ঢাকা
জুন ২৬, ১৯৭১

অধিকাংশ যানবাহন অকেজো হওয়ার ফলে অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি

পাকিস্তানের অনেক স্থানে খাদ্যাভাব মারাত্মক হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলে নগদ অর্থের সমস্যা দেখা দিয়েছে, পাটকলগুলো বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গেরিলারা প্রধান প্রধান সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যাহত করে চলেছে।

এখানে অবস্থানরত বেশির ভাগ বিদেশী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এতোকিছু সত্ত্বেও পূর্বাঞ্চলে সেনাদখল কায়েম রাখার অর্থনৈতিক মাশুল গুণতে, অন্তত আশু দিনগুলোর জন্য, পাকিস্তান সরকার প্রস্তুত রয়েছে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন দমন প্রচেষ্টায় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ওয়াকেবহাল বিদেশী উৎস থেকে জানা যায়, দেশের অভ্যন্তরে তাঁদের ফিল্ড ট্রিপের সময় তাঁরা কতক এলাকায় খাদ্যসঙ্কট দেখতে পেয়েছেন, বিঘ্নিত যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি না হলে এটা মারাত্মক সঙ্কটের রূপ নিতে পারে।

সমস্যাপীড়িত একটি ক্ষেত্র হচ্ছে দেশের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল, স্বাভাবিক অবস্থায় যা পাশের জেলাগুলোতে চালের যোগানদার উদ্বৃত্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। বিদেশী অর্থনীতিবিদরা জানান যে, উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল জনবিরল হয়ে পড়েছে, মাঠে চাষীর দেখা বিশেষ পাওয়া যায় না। বাঙালিদের দমনের জন্য ২৫ মার্চ থেকে পাকবাহিনী যে অভিযান চালাচ্ছে তার থেকে বাঁচার জন্য অধিকাংশ চাষী মনে হয় ভারতে পালিয়েছে।

ধ্বংস ও লুট

বিদেশী উৎস মতেপ্রকাশ, উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে খাদ্য মজুত হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে কিংবা লুণ্ঠিত অথবা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া

হয়েছে। তাঁরা বলেন, অবস্থার অবনতি উপোষ থাকার পর্যায়ে যায় নি, তবে মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য জুটছে না এবং দু'তিন মাসের মধ্যে আহার জোটানোর সমস্যা দেখা দেবে।

একজন অর্থনীতিবিদ বলেন, 'এই মুহূর্তে মৃত ব্যক্তির চাইতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেশি।' বিশেষজ্ঞরা জানান, পূর্ব পাকিস্তানে সামগ্রিকভাবে দু'মাসের খাদ্য সরবরাহ মজুত রয়েছে এবং বড় সমস্যা হচ্ছে ঘাটতি এলাকায় খাদ্য পাঠাবার ব্যবস্থা করা।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বন্দর চট্টগ্রামের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এসব এলাকায় গেরিলা তৎপরতা যথেষ্ট বলেই জানা যায়। পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৭০ শতাংশই এই রেলপথে বাহিত হয়। সড়কপথের প্রধান সেতুগুলো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ সাধারণত বছরে দুই মিলিয়ন টন, চলতি বছর তা প্রায় তিন মিলিয়ন টনে দাঁড়াতে পারে।

পলাতক বন্দর শ্রমিক

পরিবহনের বিপর্যয় ছাড়াও চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের কাজকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গুদামে স্থানসঙ্কট ও শ্রমিক ঘাটতি দ্বারা, কেননা ডক শ্রমিকদের অনেকেই দেশের গভীর অভ্যন্তরে অথবা ভারতে চলে গেছে।

বন্দরে মাল জমে যাওয়ার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সচরাচর যে দেশ পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক এক মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য পাঠিয়ে থাকে, সাময়িকভাবে তাদের খাদ্য চালান বন্ধ রেখেছে।

প্রধান আরেক খাদ্য ঘাটতি এলাকা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের বদ্বীপ অঞ্চল, বিগত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে যেখানে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ, ধ্বংস হয়েছিল খেতের অধিকাংশ ফসল। দ্বীপাঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকায় খাদ্য মজুতের পরিমাণ খুব কম, তবে প্রথমে যেমন ভাবা হয়েছিল অবস্থা ততো মারাত্মক নয়, কেননা কিছু রিলিফ এখানে এসে পৌঁছেছে।

বিদেশী উৎস জানায়, এতদ্‌সত্ত্বেও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে এই অঞ্চল দুর্ভিক্ষ এলাকায় পরিণত হতে পারে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের খুলনা জেলাতেও খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, কেননা হিন্দু কৃষক ও খেতমজুরদের অনেকেই পালিয়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা সেনাবাহিনীর বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে মনে করা হয় ভারতের চর ও মুসলিম জাতির শত্রু।

আরেকটি অজানা দিক হচ্ছে ছয় মিলিয়ন বাঙালির ভারতে পালানোর মতো ব্যাপক দেশান্তরের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া। তাদের দেশত্যাগের ফলে ফসল ও শিল্প উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি হ্রাস পেয়েছে পণ্যভোগ।

এমনকি যেসব এলাকায় ধানের সরবরাহ ভালো সেখানে রয়েছে নগদ অর্থের সঙ্কট। অনেক গ্রামবাসীর পর্যাপ্ত ক্রয় ক্ষমতা নেই, পলায়নপর হিন্দুরা স্বল্প মূল্যে সমস্ত কিছু বিকিয়ে দিলেও তারা সেটা কিনতে পারছে না।

অর্থ সঙ্কটের মূল কারণ গ্রামে সরকারের ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তা, সেচের খাল ও বাঁধ তৈরির কাজ করে যেসব মজুর দৈনিক ৬০ সেন্ট করে আয় করতো তারা এখন একেবারে বেকার।

সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে আছে। সরকারি কৃষি প্রযুক্তিবিদ ও বেসরকারি সেচকূপ কন্ট্রাক্টররা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে ভয় পাচ্ছে। বিদেশী পরামর্শদাতা ও প্রকৌশলীরা ঢাকা অফিসে বসে কালক্ষেপণ করে চলেছে। সরকারি দপ্তর খোলা রইলেও কর্মচারী হাজিরা অনেক কম এবং উন্নয়নমূলক কোনো কাজ হচ্ছে না।

পাটকলগুলো তাদের পূর্বতন ক্ষমতার ভগ্নাংশ মাত্র চালু রেখেছে। পূর্বাঞ্চলের পাট হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি এবং পাকিস্তানের মূল রপ্তানি ও বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী।

পুরোমাত্রায় সাহায্য আবার চালু করার পূর্বশর্ত হিসেবে অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিরীক্ষণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের যে প্রতিনিধিদল সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান সফর করেছেন তারা এরকম একটি অর্থনৈতিক ছবিই দেখতে পেয়েছেন।

এখানকার বিদেশী অর্থনীতিবিদরা জানান, বিশ্বব্যাঙ্কের টিম হতবাক ও আলোড়িত বোধ করেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান অর্জিত হয় ও সামরিক সরকার বাস্তবোচিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে, ততোদিন সাহায্য স্থগিত রাখার সুপারিশ করেছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক কাজ করছে ১১-জাতি কনসোর্টিয়ামের সমন্বয়কারী হিসেবে, যারা পাকিস্তানকে বার্ষিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। পাকিস্তান এই সাহায্যের ওপর বড়ভাবে নির্ভরশীল। মার্কিন সাহায্যের বড় অংশ—বার্ষিক প্রায় ২০০ মিলিয়ন—এই কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমেই প্রদত্ত হয়।

বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে সেনা-তৎপরতা পাকিস্তান কতকাল চালিয়ে যেতে পারবে সেটা এখন ঢাকার বৈদেশিক মহলে জোর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার কমে এলেও যেমনটা ভাবা হয়েছিল পরিস্থিতি ততো খারাপ নয়। একটি কারণ হচ্ছে স্বীয় বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের ওপর পাকিস্তান এককভাবে স্থগিতাদেশ জারি করেছে। আরেকটি কারণ হচ্ছে লড়াই শুরুর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় কোনো আমদানিই ঘটে নি, এ ক্ষেত্রে তাই সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটেছে। সর্বোপরি, সঙ্কট শুরুর আগে ঘটনাচক্রে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জন্য বিপুল কাঁচামাল পশ্চিম পাকিস্তানে মজুত ছিল।

সব মিলিয়ে বিদেশী অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মরিয়া অবস্থার কিনারে রইলেও পূর্বাঞ্চলে দখলদারীর আশু অবসানের তা কারণ হয়ে উঠবে না।

ডেটলাইন : ফরিদপুর
জুন ২৯, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের শহরে সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসের লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দু জনগণ

[নিচের বার্তাটি পাঠিয়েছেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা গত বুধবার যাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।]

এই শহরে যেসব দোকান এখনো অক্ষত রয়েছে তার মধ্যে যেগুলো হিন্দুদের সেখানে পাকিস্তানি সৈন্যরা হলুদ রঙে বড় হরফে লিখে রেখেছে 'এইচ'। তাদের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু এদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের সম্পত্তি চিহ্নিত করতেই এই কাজ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা আর্মির সন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই না পেলেও হিন্দুদের চাইতে নিরাপদ অনুভব করে থাকে এবং তাঁরা তাঁদের বাড়িঘর দোকানে 'মুসলমানের বাড়ি' জাতীয় কথা লিখে দিয়েছে। তুলনামূলকভাবে স্বল্প-সংখ্যক খৃষ্টান, যাঁদের অধিকাংশ ব্যাপ্টিস্ট, দরজার ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকেছে এবং জামায় লাল সুতো দিয়ে তা সেলাই করে নিয়েছে।

সড়ক পথ ও ফেরিতে রাজধানী ঢাকা থেকে ৮৫ মাইল দূরবর্তী ওপ্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত ফরিদপুর শহর পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কতক শহরের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন দমনের জন্য ২৫ মার্চ সূচিত অভিযানের অংশ হিসেবে এপ্রিলে এখানে সেনাবাহিনীর আক্রমণ ঘটে।

ফরিদপুরে যদিও বেশকিছু দোকানপাট দগ্ধ হয়েছে, যার অধিকাংশই হিন্দু মালিকানাধীন, তা সত্ত্বেও বলা যায় শহরের অবকাঠামো অক্ষত রয়েছে। কিন্তু জীবনযাত্রার আর সব দিক একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে এবং ঘৃণা, সন্ত্রাস ও ভয়, শহরের জীবনকে যা দুমড়েমুচড়ে দিয়েছে, তা সাড়ে সাত কোটি লোক অধ্যুষিত পূর্ব প্রদেশের আর সব শহরের সঙ্গে ফরিদপুরকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ফরিদপুরের ৩৫,০০০ শহরবাসীর অর্ধেক

মাত্র ফিরে এসেছে, তবে এই প্রবাহ বাড়ছে। সম্প্রতি আর্মি স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা দেখাতে মানুষ হত্যা ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার কাজ কিছুটা কমিয়ে এনেছে। জুনের মধ্যভাগ থেকে কৌশলের এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এটা ঘটেছে বিদেশী সংবাদদাতাদের অত্র অঞ্চলে আবার প্রবেশের অনুমোদন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার ঠিক আগে-ভাগে।

ফরিদপুরের ১০,০০০ হিন্দুর কতজন মারা গিয়েছে সঠিকভাবে বলা শক্ত, অন্যরা সীমান্ত পার হয়ে পালিয়ে গেছে ভারতে। কতক হিন্দু ফরিদপুরে ফিরে আসছে ঠিকই, তবে আর্মির মন পরিবর্তনের ওপর আস্থাশীল হয়ে নয়, বরং চরম হতাশা থেকে। বাস্তুচ্যুত মানুষ হয়ে ভারতে বসবাস করতে চায় না তাঁরা এবং এটাও অনুভব করে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো স্থানই তাঁদের জন্য নিরাপদ নয়। কাজে কাজেই নিজ শহরেই বরং এই নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হওয়া যাক।

একজন ক্ষৌরকার বলেছিল যে, সে এখনও লুকিয়ে আছে, তবে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য গোপনে শহরে ঢোকে। অন্নের সংস্থান করার জন্য যেটুকু সময় কাজ করা দরকার, করে। সে বলেছিল, 'আমি চোরের মতো শহরে ঢুকি, চোরের মতো শহর ছেড়ে যাই।'

যেসব হিন্দু শহরে এসেছে রাত্রে তাঁরা পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে। এক তরুণ কাঠমিস্ত্রি আমাকে জানালো, 'আমরা কেউ রাতে ভালোভাবে ঘুমুতে পারি না, দিনের আলো সামান্যই ভরসা যোগায়।'

এটাই আমাদের আবাস

৭০ বছরের এক বৃদ্ধ হিন্দু রমণী, যাঁর ঘাড়ে গুলি লেগেছিল, তিনি বলেছিলেন যে, পরিস্থিতি ভয়ানক খারাপ এবং চরম ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানেন 'এটাই আমাদের আবাস, আমরা সোনার বাংলায় থাকতে চাই।' ২১ এপ্রিল আর্মি ফরিদপুর এলে বৃদ্ধা ও তাঁর ৮৪ বছরের স্বামী আশ্রয়ের জন্য তিন মাইল দূরের বদিবাঙ্গি গ্রামে যান। পরের দিন সৈন্যরা এই গ্রাম আক্রমণ করে এবং স্থানীয় বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ৩০০ হিন্দুকে সেখানে হত্যা করা হয়।

বৃদ্ধা বর্ণনা করছিলেন যে, পালাবার সময় পা পিছলে তিনি পড়ে যান এবং দুজন সৈন্য তাঁকে ধরে ফেলে। তারা তাঁকে মারধোর করে গয়নাগাটি টেনে ছিঁড়ে নেয় এবং একেবারে সামনে থেকে গুলি ছোঁড়ে। এরপর মৃত ভেবে তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায়।

বৃদ্ধা ও তাঁর স্বামীর একখণ্ড জমি ছিল যেখানে ঘর তুলে তাঁরা ভাড়া দিয়েছিল। তিনি বললেন, এখন ভিটের মাটিটুকু ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই।

হিন্দুদের বিরুদ্ধে সেনাভিযান ছিল—এবং কতক ক্ষেত্রে এখনও রয়েছে—সুসংগঠিত। সৈন্যরা প্রায় প্রতিটি গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে জানতে চেয়েছে হিন্দুরা কোথায় বাস করে। হিন্দু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে হয় বিক্রি করা হয়েছে নতুবা দিয়ে দেওয়া হয়েছে 'অনুগত' নাগরিকদের। এই সুবিধাপ্রাপ্তদের অধিকাংশই বিহারি, ভারত থেকে আগত মুসলিম উদ্বাস্তু। বিহারিদের বেশিরভাগই সৈন্যদের সঙ্গে কাজ করছে, আর্মি তাদের অস্ত্রপাতিও

দিয়েছে। যেসব এলাকায় আর্মির অবস্থান কিছুটা শিথিল করা হয়েছে, সেখানে প্রায়শ বিহারিরা হিন্দুদের হত্যা করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের ব্যাঙ্ক তহবিল আটক করা হয়েছে। বলতে গেলে কোনো হিন্দু ছাত্র অথবা শিক্ষকই বিদ্যালয়ে ফিরে আসেন নি।

ইয়াহিয়ার আশ্বাস

লুকনো আশ্রয় ও ভারত থেকে নিজ আবাসে ফিরে আসার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। ভারতে পালিয়ে যাওয়া ষাট লক্ষ বাঙালির ভেতর চল্লিশ লক্ষই হচ্ছে হিন্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রায় তাঁদের সমভূমিকা পালনের সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাক প্রেসিডেন্ট। তবে সংঘর্ষ ক্ষেত্রে কর্মরত একজন আর্মি কম্যান্ডার ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় স্বীকার করেন, তাদের নীতি হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংস করা, হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে, বিশেষভাবে হিন্দুদের, উৎখাত করা।

'রাষ্ট্রবিরোধী' হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানকে সেনাবাহিনী হত্যা করলেও মূল দোষ তারা চাপিয়ে দিচ্ছে হিন্দুদের ওপর। সামরিক প্রশাসন স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করছে হিন্দু ভারত ও তার এজেন্টদের।

ফরিদপুরে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় গোটা পরিধি জুড়েই, সেনাবাহিনী আসার আগে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। আর্মি এখন এমন বিরোধ উস্কে দিতে চাইছে। এপ্রিল মাসে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফরিদপুর শহর-কেন্দ্রে দুইজন হিন্দুর শিরশ্ছেদ করে তাঁদের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কতক হিন্দু যখন প্রাণ বাঁচাতে ইসলাম ধর্মান্তরণের জন্য প্রার্থনা জানায়, তাঁদেরকে কাফের গণ্য করে গুলি করে হত্যা করা হয়। (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য ধর্মান্তরণ গৃহীত হয়ে থাকে)।

হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মুসলমানদের আর্মি বাধ্য করেছিল হিন্দুবাড়ি লুট করতে। তাঁদেরকে বলা হয় হিন্দুবাড়ি আক্রমণ না করলে তাঁদেরকেই হত্যা করা হবে। এর ফলে ফরিদপুর এলাকায় অধিকাংশ হিন্দুবাড়ি—কারো কারো মতে ৯০ শতাংশ বাড়িঘর, লুণ্ঠিত হয়েছে। এত কিছু করবার পরও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কোনো হিন্দু-বিদ্বেষী মনোভাব দেখা যায় না। হিন্দুদের আশ্রয়দান ও রক্ষার জন্য অনেকে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে তাতে ভয়ঙ্কর মর্মপীড়ার কথা জানিয়েছেন অন্যেরা। সেইসঙ্গে এটাও স্বীকার করেছেন যে প্রাণভয়ে কোনোরকম সহায়তা করা থেকে তাঁরা বিরত রয়েছেন।

বস্তুত অনেক বাঙালি মনে করেন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান বন্ধন জোরদার করতেই কেবল আর্মি কামিয়াব হয়েছে।

ডেটলাইন : ফরিদপুর
জুন ২৯, ১৯৭১

বাঙালিদের 'ভীতুর ডিম' আখ্যায়িত করেছে এক পাকিস্তানি

[নিম্নের সংবাদটি প্রেরণ করেছেন ৩০ জুন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা]

ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত ফরিদপুর জেলার সামরিক কম্যান্ডার মেজর নাজির বেগ হচ্ছেন পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচ উপজাতির লোক, দেখতে গাট্টাগোট্টা এই ব্যক্তি তাঁর বিশ বছরের সামরিক জীবনের প্রায় ছয় বছর কাটিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে। দেশের এই পূর্বাংশের বাঙালিদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞার ভাব পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে শুধু যে বহুল প্রচলিত ধারণা, তা নয়, খুব গর্বের সাথেই সেটা প্রকাশ করা হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বলছিলেন, 'বাঙালিরা হচ্ছে ভীতুর ডিম, পেছন থেকে ছুরি মারার কোনো সুযোগ তারা হারাবে না।'

বাক্যবাগীশ মেজর

মেজরের মতে, এদের ভেতর সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে হিন্দুরা, কেননা তারা দেশের রক্ত শুষে নিয়ে অর্থকড়ি পাঠাচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু দেশ হিন্দু ভারতে।

পূর্ব পাকিস্তানে সপ্তাহকাল ঘুরে বেড়াবার সময় এটা বেশ লক্ষ্য করা গেছে যে অনেক আর্মি অফিসার মেজর বেগের মতো স্পষ্টভাষী না হলেও বিশ্বাসে তাঁর কাছাকাছি। দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আমাদের এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল যে ভবনে, সেটি ছিল আওয়ামী লীগের জেলা সদর কার্যালয়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনকামী এই দলটি এখন নিষিদ্ধ। মেজর কথা বলতে খুব আগ্রহী। একজন বিদেশীকে তাঁর মতের যথার্থতা প্রমাণে ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। মাঝে মাঝেই হয়ে উঠছিলেন উত্তেজিত। তিনি বললেন যে, তাঁর বাহিনী ফরিদপুরে ঢোকার সময় কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নি। 'একটি বুলেটও ছোঁড়া হয় নি'। শহরের ধ্বংসযজ্ঞ এবং শহরবাসীদের হত্যা

সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো এসব 'দুষ্কৃতকারীদের কাজ'—বাঙালি বিদ্রোহীদের বোঝাতে পাকিস্তান সরকার এই শব্দটিই ব্যবহার করে।

শহরের সন্ত্রস্ত অধিবাসীদের কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে এই দর্শনার্থীকে বলেছিল হত্যা ও ধ্বংসলীলার সবটাই পাক আর্মির কাজ। সেটা অস্বীকার করলেন মেজর বেগ।

'সামান্য এক চুলকানি মাত্র'

মেজর আরো বললেন, 'আমাদের লোকদের সবকিছু ঠিকভাবে বোঝানো হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে বিপদাপন্ন অপর মুসলমান ভাইদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের এখানে আনা হয়েছে। ধর্ষণ, লুটতরাজ অথবা সমাজ-বিরোধী কাজ এরকম কোনো কিছু ঘটে নি। ইসলাম ধর্মে এসব কাজ নিষিদ্ধ। ওরা এসেছে একটি মুসলিম দেশে, কোনো বিদেশবিভুঁইয়ে নয়।'

এলাকায় এখন কোনো প্রতিরোধ রয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'সামান্য চুলকানির চাইতে বেশি কিছু নয়।' তিনি জানালেন যে, একজন পেশাদার সৈনিক হিসেবে তিনি এতে খুবই হতাশ বোধ করছেন।

তিনি বলে চললেন, 'বাঙালিরা নরম প্রকৃতির মানুষ, ভীতুর ডিম। একটা বুলেটের শব্দ শুনতে পেলেই শত শত মানুষ মুরগির ছানার মতো ছুটোছুটি শুরু করে। তাদের সাহস বলতে কিছু নেই।'

তিনি আরো বললেন, 'সামনাসামনি তারা ভেড়া হয়ে থাকে। আর পেছনে গেলে বাঘ হয়ে ওঠে। এই মানুষেরা আপনার পিঠে ছুরি বসাবার সুযোগ পেলে তা কখনোই ছাড়বে না।' সামান্য বিরতি দিয়ে আবার বললেন যে, এটা অবশ্য তাঁর নিজের মূল্যায়ন এবং একশত ভাগ সঠিক নাও হতে পারে। তিনি জানালেন, 'এখানকার সাধারণ মানুষেরা খুব সরল, তাদের চাহিদা সামান্যই এবং তারা বিশেষ গোলযোগসৃষ্টিকারী নয়।'

এত অধিকসংখ্যক হিন্দু নিহত হওয়ার কারণ কি জানার জন্য চাপাচাপি করতে মেজর আবারো অস্বীকার করলেন যে এজন্য তার সৈনিকেরা দায়ী। এরপর পুনরায় মন্তব্য যোগ করলেন, 'এমন একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এতো বিরাট জনসংখ্যার ভেতর থেকে কিছু সাধারণ লোক যদি দুর্গতি পোহায় সেটা খুব স্বাভাবিক নয় কি?'

মেজর বেগ জানালেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ক্ষেত্রে আধিপত্য করেছে হিন্দুরা এবং অনৈসলামী ভাবধারা প্রচার করে তারা অন্তর্ঘাতী কাজ করেছে। তাঁর মতে, 'তা না হলে পূর্ব পাকিস্তানের এমন পচন ধরতো না। এইসব শিক্ষক এবং সমস্ত হিন্দু কোনোদিনই পাকিস্তানের বাস্তবতা মেনে নিতে পারে নি। তারা একটা স্বপ্নের জগতে বাস করছে। তারা বিশ্বাস করে যে ভারতমাতার খণ্ডাংশ আবার জোড়া লাগবে।'

তবে মেজর সাহেব স্থিরবিশ্বাসী যে ভারত কখনো পাকিস্তানকে হজম করতে পারবে না।

ডেটলাইন : ঢাকা
জুলাই ৪, ১৯৭১

'বিদেশী বাহিনী' চাপিয়ে দিচ্ছে স্বীয় কর্তৃত্ব

'পৃথিবী কি বুঝছে না যে এরা কসাই ছাড়া আর কিছু নয়?' প্রশ্ন করলেন এক বিদেশী, বহু বছর যাবৎ যিনি পূর্ব পাকিস্তানে আছেন। 'কেউ কি বুঝছে না, বাঙালিদের চিরতরে দাসে পরিণত করার জন্য তারা হত্যা করেছে এবং এখনো করে চলেছে? এরা উৎখাত করছে গোটা গ্রাম, সকালের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু করছে, আর ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত থামছে না?'

শান্ত সৌম্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এই ভদ্রলোক কথা বলছিলেন বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনকল্পে পূর্ব পাকিস্তানে পাকবাহিনী সঙ্ঘটিত রক্তপাত বিষয়ে। এখানে বসবাসরত অধিকাংশ বিদেশী কূটনীতিক, মিশনারি, ব্যবসায়ী এই ব্যক্তির মতো একই ধরনের কথা বলেন। তিন মাসের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ক্রোধ নিয়ে তাঁরা ফেটে পড়ছেন। যা জানেন সেটা বিদেশী সাংবাদিকদের বলতে তাঁরা সবিশেষ আগ্রহী। ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর দমন অভিযান শুরুর পর মাত্র পক্ষকাল আগে বিদেশী সাংবাদিকদের প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ ও ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বিদেশী গণমাধ্যমকে অত্যন্ত বৈরী হিসেবে বিবেচনা করে। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে শৃঙ্খলা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে, এটা দেখাতেও তারা মরিয়া হয়ে আছে।

বস্তুত কতক এলাকা ব্যতীত পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে—সীমান্ত-ঘেঁষা ঐসব এলাকায় 'মুক্তিফৌজ' বা লিবারেশন আর্মি সক্রিয় রয়েছে এবং ভারতের

সহায়তা পেয়ে তাঁদের তৎপরতা বাড়ছে।

তথাপি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আর যাই হোক স্বাভাবিক নয়। কেননা এটা স্পষ্টত ও খোলাখুলিভাবে বিদেশী বাহিনীর সামরিক দখলদারীর ঘটনা।

বাঙালি পুলিশের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা পুলিশদল। বিভিন্ন সরকারি বিভাগে এমন কি টাইপিস্ট পর্যায়েও পূর্ব পাকিস্তানিদের বদলে বসানো হচ্ছে ১০০০ মাইল দূর থেকে উড়ে আসা পশ্চিম পাকিস্তানিদের।

নিহত অথবা শহর ছেড়ে গ্রামে পলাতক বাঙালিদের বাড়িঘর, দোকানপাট তুলে দেয়া হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালি মুসলমানদের হাতে যারা পাকবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করছে। সেনাবাহিনীর বিশেষ লক্ষ্য সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দির ধূলিসাৎ করা হচ্ছে, আর কিছু না হোক অন্তত এটুকু দেখাবার জন্য যে যাঁরা সেনাবাহিনীর 'ইসলামী সংহতি' পরিকল্পনার শামিল নয় তাঁরা সত্যিকার পাকিস্তানি নয় এবং তাদের সহ্য করা হবে না।

মাত্র তিন মাস আগে রাজপথে উল্লসিত মিছিল করে গেছে এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জোরগলায় স্লোগান তুলেছে যে বাঙালি যুবকেরা, তাঁরা এখন ফিসফিস করে কথা বলে। বিদেশী সাংবাদিকদের হাতে চট্ করে গুঁজে দেয় কোনো চিরকুট। বিড়বিড় করে দ্রুত জানিয়ে যায় কোনো গণহত্যার বিবরণী, পরিবারের সদস্যদের হত্যা অথবা গোটা গ্রাম ধ্বংসের কাহিনী। বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত বেনামি এমনি বহু চিঠি প্রতিদিন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সাংবাদিকদের ডাকবাক্সে এসে জমা হচ্ছে।

ভয়–ভীতির থাবার বিস্তার ঘটেছে প্রবল। কিন্তু একটি নতুন চেতনার উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। সাদাসিধা ও রোমান্টিক বাঙালি জাতির অধিকাংশ এখন মনে করেন তাদের নিজেদেরকেই সব করতে হবে, অন্য কোনো দেশ তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে না এবং কাজটি হবে দীর্ঘমেয়াদী।

সীমান্ত এলাকা এবং সীমান্তের অপর পারের নিরাপদ আশ্রয় থেকে তৎপর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ সট্‌কে পড়ছে। বাঙালি গেরিলাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়ে চলেছে। সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন দালালকে খতম করা হয়েছে এবং ঢাকায় হাতে–তৈরি বোমা বিস্ফোরণের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিরোধ এখনও বিক্ষিপ্ত, প্রান্তিক ও অসংগঠিত, কিন্তু তা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

প্রতিটি সন্ত্রাসমূলক কাজের প্রতিশোধ নেয় পাকবাহিনী নিকটস্থ বাঙালি সাধারণজনের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে। নোয়াখালী জেলায় পাক আর্মির 'শান্তি কমিটি'র একাধিক সদস্য ও তাদের স্ত্রী–পুত্রদের সম্প্রতি মুক্তিবাহিনী খতম করার পর সেনাবাহিনী কয়েক শত বেসামরিক নাগরিককে ধরে এনে হত্যা করেছে বলে জানা যায়।

একদা যেমন ব্যাপকভাবে ভাবা হয়েছিল যে, দখলদারিত্বের ব্যয়ভার খুবই চড়া হয়ে উঠবে এবং তা দ্রুত পাততাড়ি গোটাতে পাকিস্তানকে বাধ্য করবে, এখন সে ভাবনা পরিত্যক্ত হয়েছে। এমন কি বিশ্বব্যাঙ্ক কনসোর্টিয়ামের বার্ষিক বিপুল সাহায্য, যা স্থগিত রাখা হয়েছে পাকিস্তানি পীড়নের সমালোচনা হিসেবে, সেটা সত্ত্বেও ইসলামাবাদ পূর্ব

পাকিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হয়।

মনে করা হয়েছিল জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানে বেসামরিক শাসন প্রবর্তনের দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত পরিকল্পনার উন্মোচন ঘটবে। কিন্তু গত সোমবার প্রদত্ত এই ভাষণে উল্টোটাই ঘটেছে—নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে বেসামরিক সরকার গঠনের আবরণে সামরিক একনায়কত্বই বহাল থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে পশ্চিমী কূটনীতিকরা এই ভাষণকে 'বিপর্যয়কর' বলে অভিহিত করেছেন। বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট, তিনি সেনাবাহিনীর প্রধানও, দেশকে 'আল্লাহর রহমতে ... দ্বিখণ্ডিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য ... ' সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ছয় মিলিয়ন বাঙালি, যাদের বেশিরভাগ সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু, যারা ভারতে পালিয়ে গেছে 'বিদ্রোহীদের মিথ্যা প্রচারণার কারণে', তিনি তাদের প্রতি 'পূর্ণ সহানুভূতি' জ্ঞাপন করেন। তিনি 'দ্রুত পুনর্বাসনের' জন্য অবিলম্বে তাদের 'নিজ নিজ গৃহে' প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের ঠিক আগের দিন একটি আর্মি প্ল্যাটুন ঢাকা থেকে ৩০ মাইল দূরে মূলত হিন্দু অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে হামলা চালিয়ে হত্যা, লুট ও অগ্নিসংযোগ ঘটায়। আর্মি এ পর্যন্ত কতো বাঙালি হত্যা করেছে তার সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না, তবে এখানকার নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে এই সংখ্যা ১০০,০০০-এর ওপরে, চাই কি আরো বেশি হতে পারে।

এখানকার একজন পশ্চিমী ব্যক্তি জানালেন, 'মনে হচ্ছে যেন ভূমিদাসদের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় বাহিনীর অভিযান চলছে। পূর্ব পাকিস্তানকে দখলে রাখা ও নিঃশেষে দোহন করতে যে কোনো ব্যবস্থা তারা অবলম্বন করতে পারে। বাঙালিরা যদি প্রতিরোধের ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট হয়, তবুও দাগ কাটবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে পাঁচ-দশ বছর লেগে যাবে।'

এই নিবন্ধ তারযোগে পাঠানোর পর নিউইয়র্ক টাইমস-এর দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয়। নয়াদিল্লি পৌঁছে তিনি জানিয়েছেন যে, 'পাকিস্তানের নিরাপত্তার স্বার্থে' পাক সরকার তাঁকে দেশত্যাগের আদেশ দেয়।

ডেটলাইন : নয়াদিল্লি, ভারত
জুলাই ১৪, ১৯৭১

বাঙালি দমনের নীতি অনুসরণ করছে পশ্চিম পাকিস্তান

৩০ জুন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত নিউইয়র্ক টাইমস–এর নয়াদিল্লি সংবাদদাতা নিম্নোক্ত বিবরণ পাঠিয়েছেন।

ইদানীংকালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহরের জনবিরল পথে শ্রম–শিবিরের জন্য 'রাষ্ট্র–বিরোধী' বন্দীদের বহনকারী আর্মি ট্রাকের চলাচল বেড়ে গেছে। বন্দীদের মাথার চুল ছাঁটা, পায়ে জুতো নেই, হাফপ্যান্ট ছাড়া পরনে আর কোনো বস্ত্র নেই—সব মিলিয়ে পালানো বেশ দুষ্কর।

প্রতিদিন ঢাকা বিমানবন্দরে হাজার মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত বিমান নামিয়ে দিয়ে যায় সৈন্যদের, নজর এড়ানোর জন্য তারা উপজাতীয় ঢোলা পাজামা–পাঞ্জাবি পরে থাকে।

বাঙালি সংস্কৃতি উৎসাদনের লক্ষ্যে রাস্তার নামফলক থেকে সকল হিন্দু নাম, এমন কি জাতীয়তাবাদী মুসলিম নামও, মুছে ফেলা হচ্ছে। বাঙালিরা যাকে বলে থাকে 'কসাই', পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসক সেই লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের নামে ঢাকার শাখারী বাজার রোডের নতুন নামকরণ ঘটেছে।

এসব হচ্ছে অসংখ্য ঘটনার কয়েকটি মাত্র, বর্তমান সংবাদদাতা পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশে তার সাম্প্রতিক সফরকালে যা দেখতে পেয়েছে, এবং সেসব থেকে বোঝা যায় যে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ৭৫ মিলিয়ন জনগণের এই অঞ্চল পদানত রাখা ও তাদের দখলদারী বহাল রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গুর অর্থনীতি, সরকারি প্রশাসনের ভগ্নদশা, বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্রমবিস্তৃত গেরিলা তৎপরতা, সেনাবাহিনীতে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জনগণের সঙ্গে বর্ধমান ফারাক সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা একগুয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে।

পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যসংখ্যা বাড়াবার উদ্দেশ্যে সরকার ইতিমধ্যে আইরিশ

মালিকানাধীন ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ-এর কাছ থেকে দু'টি বোয়িং-৭০৭ ভাড়া করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত সৈন্য সংখ্যা ৭০,০০০ থেকে ৮০,০০০ বলে জানা গেছে।

প্রতিদিন সৈন্য নিয়ে আসা ছাড়াও সরকার দলে দলে পাকিস্তানিদের নিয়ে আসছে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি দায়িত্বে বসাবার জন্য। দায়িত্বশীল পদে কোনো বাঙালির ওপরই তাদের আস্থা নেই ; এমন কি ঢাকা বিমানবন্দরে ঘাস কাটে যে ব্যক্তি সেও একজন অবাঙালি।

বাঙালি ট্যাক্সি ড্রাইভারদের দেখাও বিশেষ মেলে না। তাদের বদলে নেওয়া হয়েছে ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তু অবাঙালি বিহারি মুসলমানদের যারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্যাধীন সরকারের পক্ষ নিয়েছে এবং সেনাবাহিনীর বেসামরিক বাহু হিসেবে কাজ করে তাদের খবরাখবর ও মদদ যোগাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষার ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে তার পরিবর্তে উর্দু চালু করতে চাইছে। সৈনিকরা অবজ্ঞার সঙ্গে বাঙালিদের জানাচ্ছে যে তাদের ভাষা কোনো সভ্য ভাষা নয় এবং জীবনে কিছু করতে চাইলে তাদের উচিত হবে ছেলেমেয়েদের উর্দু শিক্ষাদান। ভীত ব্যবসায়ীরা বাংলার বদলে ইংরেজি সাইনবোর্ড বসাচ্ছে, কেননা উর্দুভাষা তাদের অজানা।

শান্তি কমিটি গঠন

গোটা পূর্ব পাকিস্তানে আর্মি নতুন আধা-সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং 'অনুগত' নাগরিকদের সশস্ত্র করে তুলছে, যাদের কাউকে কাউকে নিয়ে আবার শান্তি কমিটি গঠন করছে। বিহারি এবং অন্যান্য অবাঙালি উর্দুভাষী রিক্রুট ছাড়াও রয়েছে সেনাবাহিনীর দীর্ঘকালের সমর্থক এক ক্ষুদ্র বাঙালি মুসলিম গোষ্ঠী—এরা মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর মতো দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের সমর্থক। বিগত ডিসেম্বরের নির্বাচনে এই দলগুলো পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় সংসদের একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারে নি।

এক অর্থে নির্বাচনই সঙ্কট বয়ে এনেছে, কেননা প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনকারী দল আওয়ামী লীগ অপ্রত্যাশিতভাবে জাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ইতিপূর্বে অবদমিত বাঙালিরা যখন জাতীয় ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা নিতে যাচ্ছিল তখন পশ্চিম পাকিস্তানের অগ্রণী রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় এই অধিবেশনে নতুন সংবিধান রচনার মাধ্যমে পাকিস্তানে বেসামরিক শাসন সূচিত হওয়ার কথা ছিল এবং পিপল্‌স পার্টির পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

আলোচনা ও আক্রমণ

পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় এবং সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করে

আওয়ামী লীগ আহূত অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয় বাঙালিরা।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য বিমানযোগে ঢাকা আসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। আলোচনা চলাকালে ২৫ মার্চ রাতে স্বাধিকার আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের ওপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে শেখ মুজিবকে বন্দী করা হয়।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পক্ষবদলকারী সদস্যদের পরিচালনায় প্রথমদিককার বাঙালি প্রতিরোধ দ্রুতই ছত্রখান করে দেয়া হয়। কিন্তু এখন ভারতীয় সীমান্তবর্তী নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে নতুন রিক্রুট ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বলীয়ান হয়ে গড়ে উঠছে ভিয়েতনাম-ধাঁচের গেরিলা যুদ্ধ—পাকবাহিনীর জন্য এই যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়ছে।

আক্রমণ শুরুর পর থেকে পাকবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে অসংখ্য বাঙালি—বিদেশী কূটনীতিকদের হিসেবে ২০০,০০০ থেকে ২৫০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে—যার বেশিরভাগ প্রাণ দিয়েছে গণহত্যাযজ্ঞে। যদিও পাক আর্মির প্রথমদিককার টার্গেট ছিল বাঙালি মুসলমান ও ১০ মিলিয়ন হিন্দু জনগোষ্ঠী, এখন আর্মি হিন্দুদের ওপরই মনোনিবেশ করছে বেশি এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকরা একে ধর্মযুদ্ধ বলে চিহ্নিত করছে।

পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা বহুকাল যাবৎ হিন্দুদের ইসলামের অনিষ্টকারী হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। এখন তারা এদের দেখছে হিন্দু ভারতের এজেন্ট হিসেবে, প্রতিবেশী যে দেশ পাকিস্তান ভাঙার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ষড়যন্ত্র বিস্তার করেছে বলে পাকিস্তানের অভিযোগ।

সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ছয় মিলিয়ন বাঙালি ভারতে পালিয়ে গেছে বলে মনে করা হয়, তাদের মধ্যে অন্তত চার মিলিয়ন হচ্ছে হিন্দু। সেনাবাহিনী এখনও হিন্দুদের হত্যা করছে, তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

তবে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা দাবি করছে যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে এবং হিন্দুদের প্রতি 'তাদের বাড়িঘরে ফিরে আসার' জন্য আবেদন জানিয়ে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে তাদের আর ভয়ের কিছু নেই। শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন উদ্বাস্তু ফিরে এসেছে এবং বিদেশীদের দেখাবার জন্য সরকার যেসব অভ্যর্থনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল সেগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে আছে।

সাহায্য পুনরায় চালুর আবেদন

সেনা কম্যান্ডাররা সম্প্রতি বলে বেড়াচ্ছে যে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তাদের বাড়িঘরে ফিরে আসাকে স্বাগত জানানো হবে। পর্যবেক্ষকরা এই সদিচ্ছা প্রকাশকে সন্দেহের চোখে দেখছেন, তাঁরা উল্লেখ করছেন যে ধাঙড়, ঝাড়ুদার, ধোপা ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাড়া নোংরা কাজ করানোর জন্য আর কোনো নির্ভর আর্মির নেই।

ভারতে চলে যাওয়া উদ্বাস্তু ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে আরো লক্ষ লক্ষ গৃহচ্যুত বাঙালি রয়েছে সেনা অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল এবং এখনও ফিরে যেতে

ভয় পাচ্ছে।

জনচক্ষুর অপেক্ষাকৃত অগোচরে এবং অধিকতর সূক্ষ্মভাবে অপারেশন পরিচালনার জন্য ইদানীং সেনাবাহিনীকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বিদেশী কূটনীতিকদের মতে, এই আদেশ দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক সাহায্য পুনরায় চালু করতে ১১-জাতি কনসোর্টিয়ামকে উদ্বুদ্ধকরণে পাকিস্তানি আকাঙ্ক্ষা থেকে। সেনাবাহিনীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ সাহায্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

সাহায্য কর্মসূচির সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাঙ্কের একটি বিশেষ মিশন সম্প্রতি রিপোর্ট করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি যে ধ্বংসযজ্ঞ করেছে তাতে অন্তত এক বছর উন্নয়ন কর্মসূচি স্থগিত থাকবে। মে-জুন মাসে পূর্ব প্রদেশে এই মিশন ব্যাপক জরিপ চালিয়েছিল।

সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশীদের যথেচ্ছ চলাফেরার অনুমোদন এবং সেনা অভিযানের শুরুতে বহিষ্কৃত বিদেশী সাংবাদিকদের পুনরায় প্রবেশের অনুমতিদানকে ঢাকাস্থ কূটনীতিকরা সাহায্য পুনরায় চালুর অভিযানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ড থামে নি, যদিও এখন তা অনেক নির্বাচিত এবং ততো পাইকারি নয়। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন পরিস্থিতি একটি দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের দিকে গড়াবে।

বিদেশী মিশনারিরা, যারা এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের দূরবর্তী কোণেও কর্মরত রয়েছেন, তাঁরা প্রতিদিনই নতুন নতুন গণহত্যার সংবাদ জানাচ্ছেন। একজন মিশনারি বলেছেন যে, দক্ষিণে বরিশাল জেলার এক অঞ্চলে পাক আর্মি প্রতিদিন এক হাজারেরও বেশি হিন্দুকে হত্যা করছে। আরেক খবরে জানা যায় যে, উত্তর-পশ্চিমে সিলেট জেলায়, 'শান্তি কমিটি একটি সভা আহ্বান করে, সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে। সবাই যখন এসে জড়ো হয়েছে তখন সৈন্যরা সেখানে হাজির হয়। সমাবেশ থেকে তারা ৩০০ জন হিন্দুকে বাছাই করে দূরে সরিয়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে।'

যখনই কোনো বাঙালি প্রকাশ্যে বিদেশী কারো সঙ্গে কথা বলেন তিনি বিপদের ঝুঁকি নেন। ফেরি পারাপারের সময় বর্তমান সংবাদদাতার গাড়ির কাছে এসে বাঙালিরা ফিসফিসিয়ে জানায় আর্মির সন্ত্রাস সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত তথ্য অথবা চকিত হেসে জানায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলার খবর। ছয়-সাতজন লোক একত্র হলেই পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য বা পুলিশ এগিয়ে এসে কটমটিয়ে তাকায় বাঙালিদের দিকে এবং তারা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে।

সৈন্য ও বেসামরিক গুপ্তচরদের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাঙালিরা বিদেশী সংবাদদাতাদের তাঁদের কাহিনী জানাবার কোনো-না-কোনো উপায় বের করে নেয়—কখনো গাড়িতে কাগজ গুঁজে দেয় কিংবা আয়োজন করে গোপন সভার।

ঢাকা থেকে সামান্য দূরে এক শহরে এমনি সাক্ষাৎকালে জনৈক ব্যবসায়ী জানান কীভাবে কোনো কারণ ছাড়াই সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করে টাকা-পয়সা, ঘড়ি ছিনিয়ে নেয় এবং থানায় সোপর্দ করে। সেখানে এক রাত কাটাবার পর তিনি ছাড়া পান, তাঁর মতে, অলৌকিকভাবে।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জানান, তিনি সারারাত নামাজ আদায় করে ও দেয়ালের নানা

লেখাজোখা পড়ে কাটান—আগে যাঁরা এখানে আটক ছিলেন তাঁরা এইসব কথা লিখে রেখেছেন। সবগুলো লেখা প্রায় এক ধরনের, নিজেদের নাম-ধাম, বন্দী হওয়ার তারিখ দিয়ে লেখা হয়েছে, 'আমি হয়তো বাঁচবো না। আমার কি ঘটেছে অনুগ্রহ করে জানাবেন আমার পরিবারের লোকদের।'

সহায়সম্পদের বিপুল ক্ষতি

হত্যার সঙ্গে সমতালে সর্বত্র সহায়সম্পদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে পাকবাহিনী। গ্রাম এলাকায় রাস্তার দু'ধারে কখনো কখনো মাইলের পর মাইল বাড়িঘর জ্বালিয়ে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। মহানগরী ও শহরগুলোতে ভারি কামানের গোলায় বড় বড় এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে।

বাঙালিরা বলে সৈন্যরা যথেচ্ছ ধ্বংসযজ্ঞে মেতেছে। আর্মি জানায়, তাদের ওপর আঘাত করা না হলে তারা গুলি ছোঁড়ে না। অথচ ফিল্ড কম্যান্ডাররা গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ শহরেই প্রতিরোধ যৎসামান্য কিংবা নেই বললেই চলে।

তাহলে কেন এতো ধ্বংসলীলা? একথা জিজ্ঞেস করলে বাঁধা জবাব মেলে, সব হচ্ছে 'দুষ্কৃতকারীদের' কারসাজি।

যদিও কিছু কিছু বাঙালি জন-অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ফিরে যাচ্ছে, বেশিরভাগ শহরই প্রায় ফাঁকা, অথবা জনসংখ্যা আগের চাইতে কম। দেশের কতক এলাকা, যেমন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, কার্যত ফাঁকা হয়ে গেছে।

অযত্নে পড়ে থাকা ধানখেত আগাছায় ভরে গেছে। যেসব পাটখেতে আগে কয়েক ডজন দিনমজুর কাজ করতো এখন সেখানে উবু হয়ে কাজ করছে গুটিকয় কামলা। পূর্ব পাকিস্তানের পাট, যা থেকে বস্তার শক্ত সুতো তৈরি হয়, জাতীয় অর্থনীতির মূল নির্ভর। পাট হচ্ছে সর্ববৃহৎ একক রপ্তানি পণ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী। যেসব ইঙ্গিত মিলছে তার থেকে বোঝা যায় এবার ফলন হবে কম।

উৎপাদন যদি বেশিও হয় তাহলেও দক্ষ শ্রমিকদের বিপুলভাবে কারখানা ত্যাগের ফলে পাটকলগুলো তা সামাল দিতে পারবে না। কারখানাগুলো উৎপাদন ক্ষমতার অনেক নিচে চালু রয়েছে।

নৌ-চলাচল ব্যাহত

সামরিক পরিবহন বিঘ্নিত এবং নৌপথে উৎপাদিত পাট কারখানায় পৌছনো বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যে বিদ্রোহীরা নৌচলাচলের ওপর অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইতিমধ্যে তারা কয়েকটি পাট বোঝাই বার্জ ডুবিয়ে দিয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের চা শিল্পের ক্ষয়-ক্ষতি আরো মারাত্মক। পশ্চিম পাকিস্তানের চাহিদা মেটাতে ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকার বিদেশে দুই মিলিয়ন পাউন্ডের ওপর অর্ডার পাঠিয়েছে।

রক্তপাত সঙ্ঘটনের অন্যতম কারণ হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি। আরেকটি

কারণ হচ্ছে হালকা-বর্ণ মধ্যপ্রাচ্যীয় পাঞ্জাবি, পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর যাদের আধিপত্য, তাদের সঙ্গে পূর্বের দক্ষিণ-এশীয় গাঢ়বর্ণ বাঙালিদের নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য। অভিন্ন ধর্ম ইসলাম ছাড়া এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিল বলে কিছু নেই।

২৪ বছর আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংখ্যালঘু (৫৫ মিলিয়ন) অথচ সমৃদ্ধতর পশ্চিম পাকিস্তানিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের হীন দৃষ্টিতে দেখেছে, শোষণ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানিরা যত দেখেছে তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্যাধীন সেনাবাহিনী এবং সেই অঞ্চলের শিল্প ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় নির্বাহ হয়েছে, ততোই তারা তিক্ত বোধ করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে যে গুটিকয় উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে সেসবের কাজও এখন বন্ধ রয়েছে সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা ও দেশের অভ্যন্তরে বেসামরিক প্রশাসনের শূন্যতাহেতু।

প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি

সেনাবাহিনী জবরদস্তিভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি কার্যকর পর্যায়ে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর চালু করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু লড়াই শুরুর আগে বন্দরের গুদামে যেসব মালামাল মজুত ছিল তা জাহাজ-বোঝাই করা ছাড়াও নতুন মালের প্রয়োজন রয়েছে।

কতক অঞ্চলে খাদ্য-ঘাটতি মারাত্মক হয়ে উঠছে এবং বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন সেনাবাহিনী যদি অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহন ব্যবস্থা মেরামত ও মজুত খাদ্য বিতরণের উদ্যোগ না নেয় তবে দুর্ভিক্ষ-পর্যায়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে।

বাঙালিদের প্রতিরোধের কারণে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। ভারতের ক্রমবর্ধমান সহায়তা, আশ্রয় ও কখনো কখনো কভ্যারিং ফায়ারের কল্যাণেও এখনো অসংগঠিত প্রতিরোধ ক্রমেই শক্তি অর্জন করে চলেছে।

হাজার হাজার বাঙালি তরুণ ডিমোলিশন ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে— প্রায়শ এটা সীমান্তের ভারতীয় দিকে ভারতীয় প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রদত্ত হচ্ছে। নতুন গেরিলাদের প্রথম দলগুলো ইতিমধ্যে দেশের ভেতর প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

সড়ক ও রেলসেতু ধ্বংস করা হচ্ছে আরো অধিক হারে, উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কতক ধ্বংসাত্মক তৎপরতা স্পষ্টতই পাকা হাতের কাজ। সড়কপথে পাতা মাইন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। প্রায়শই আর্মি, যারা সশস্ত্র ও সতর্ক অবস্থায় রয়েছে, মেরামতির কাজে স্থানীয় কন্ট্রাক্টরদের পাচ্ছে না, বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগ করে তারা ভালো কাজও পাচ্ছে না।

কুমিল্লার বাইরে অল্প কিছুকাল আগে গেরিলারা একটি রেলসেতু উড়িয়ে দিয়েছে। যে রিপেয়ার ট্রেন পাঠানো হয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে তার ফায়ারম্যানকে হত্যা করে কয়েকজনকে জিম্মি করা হয়। ট্রেন দ্রুত শহরে ফিরে যায়।

ডেটলাইন : দিল্লি, ভারত
সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৭১

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের ফারাক বাড়ছে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হচ্ছে

[সংবাদ বিশ্লেষণ]

গত কয়েক মাসে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটেছে। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ব্যতিক্রমের চাইতে নিয়ম হিসেবেই সবসময় থেকেছে বেশি, তা সত্ত্বেও এবারের ফারাক মনে হচ্ছে অনেক গভীর, তিক্ত ও মৌলিক এবং খুব সহজে এর প্রশমন হবে বলেও মনে হচ্ছে না। ভারতীয় পক্ষের তিক্ততার কারণ খুব পরিষ্কার—পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে পাকবাহিনী পরিচালিত পাঁচমাসকালের সামরিক অত্যাচারের প্রকাশ্য নিন্দাবাদ করার ক্ষেত্রে নিক্সন প্রশাসনের অস্বীকৃতি। সঙ্ঘাত শুরু হওয়ার পরেও পুরনো এক চুক্তির আওতায় পাকিস্তানকে কিছু কিছু অস্ত্রের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে নিক্সন প্রশাসনের সিদ্ধান্তও ভারতের উষ্মার কারণ ঘটিয়েছে।

এখানকার কূটনীতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, ওয়াশিংটন হয় বুঝতে পারে নি অস্ত্রের চালান ভারতে কতটা ক্রোধের সঞ্চার ঘটাবে অথবা তারা এর কোনো পরোয়াই করে না। অস্ত্রের চালান যদি কয়েক বাক্স বুলেট ও খুচরো যন্ত্রাংশ হতো তাহলেও দেখা দিতো মার্কিন-বিরোধী ক্ষোভ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে অস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ হচ্ছে ৬.২ মিলিয়ন ডলার। কোনো কোনো সিনেটরের মতে এই পরিমাণ ৩৫ মিলিয়ন ডলারের মতো সুউচ্চ।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে আশি লক্ষ শরণার্থী ভারতে পালিয়ে এসেছে তাঁরা দেশটির ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং পূর্ব ভারতের বিস্ফোরণোন্মুখ সামাজিক বাতাবরণের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে।

উত্তেজনাকর মোকাবেলা

এই সঙ্কটের ফলে প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত ভারত ও মুসলিম দেশ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়েছে চরম উত্তেজনা নিয়ে। পরিস্থিতি জাগিয়ে তুলছে পুরনো তিক্ত স্মৃতি, দেশবিভাগের সময়কার হিন্দু–মুসলিম রক্তস্নান এবং ১৯৪৭ ও ১৯৬৫ সালের স্বল্পস্থায়ী ভারত–পাক যুদ্ধ। এই পটভূমিকায় যে আবেগ এখানে মথিত হয়ে উঠছে তা অনুমানযোগ্য। বিশ্লেষকরা মনে করেন মার্কিন নীতির এই বিভ্রাটের কোনো একটি বিশেষ কার্যকারণ যদি নির্দেশ করতে হয়, তাহলে বলতে হবে, ভারতীয়দের মনস্তত্ত্ব ও মনোভাব উপেক্ষা করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'এখানে যে একটি নৈতিক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে তা আমেরিকা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ঘটনার শিকার। এটা পাইকারি গণহত্যার ঘটনা। এটা নিশ্চিতভাবে অমানবিক ঘটনা। এবং এটা আমেরিকার দিক থেকে চরম শীতল মনোভাব পোষণের নিদর্শন।'

এই মনোভঙ্গি কেবল সরকারে সীমিত নেই, ভারতীয় জীবনের সকল স্তরে এর দেখা মিলবে। গড়পড়তা ভারতীয়রা মনে করেন আমেরিকা দাঁড়িয়েছে অশুভের পক্ষে, গণহত্যার সমর্থনে ও ভারতের শত্রু পাকিস্তানের পাশে। বাঙালি শরণার্থীদের জন্য প্রদত্ত আমেরিকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা জনচিত্তে সামান্যই দাগ কাটতে পেরেছে।

মার্কিনপন্থীরা সমালোচনামুখর

এমন কি সচরাচর যাঁরা মার্কিনপন্থী তাঁরাও হয়ে উঠেছেন বৈরীভাবাপন্ন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে : 'অদ্যাবধি নিক্সন প্রশাসন বিপুলা এই মানব–ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হয়ে ইচ্ছেকৃতভাবে একটা সিনিক দৃষ্টিভঙ্গি বহাল রেখে চলেছে। এই নীতি তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে মার্কিন জনমত থেকেও, মার্কিন পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য গণমাধ্যমে যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।'

সহানুভূতিসম্পন্ন আমেরিকান জনগণ ও 'শীতল' প্রশাসনের মধ্যে যে ফারাক টেনে চলেছে ভারতীয়েরা তার প্রতিফলন দেখা যায় উদ্ধৃত বাক্যটির শেষাংশে। মার্কিন–বিরোধী মনোভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু নেই এবং এখানে বসবাসরত আমেরিকানদের প্রতি শারীরিক হুমকির কোনো প্রকাশ কোথাও দেখা দেয় নি।

এখানকার আমেরিকান কূটনীতিকরা বলছেন মার্কিন নীতি প্রণীত হয়েছে বাস্তববাদী, আবেগমুক্ত, নীরব, গঠনমূলক ও পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। উভয় শিবিরে অবস্থান বজায় রাখা, ভারতকে সংযত ও নতুন একটা যুদ্ধ শুরু করা থেকে পাকিস্তানকে বিরত রাখা এবং উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা অর্জন হচ্ছে এই নীতির লক্ষ্য। এই কূটনীতিকরা আরো বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো কঠোর বিবৃতিদান অথবা পদক্ষেপ গ্রহণ পরিহার করে আমেরিকা প্রেসিডেন্ট আগা এম. ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা হাতে রাখতে চাইছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভিমত হলো, আমেরিকা পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক সমাধান অর্জিত হওয়ার আশা রাখে এবং বর্তমান ইয়াহিয়া সরকারাধীন অখণ্ড পাকিস্তানই এটা অর্জন করার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে মনে

করে।

এই সূত্র আরো জানায় যে, পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর জন্য মার্কিন প্রশাসন ভারতের প্রতি বিরক্ত। বাঙালি গেরিলাদের নিরাপদ আশ্রয় ও সামরিক সহায়তা যুগিয়ে ভারত এটা করছে।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন জনসমক্ষে তাঁর নীতি নিয়ে কেবল একবারই কথা বলেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে 'মোটামুটি স্থিতিশীলতা' প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে সব ধরনের সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখা সংক্রান্ত একটি বিল প্রতিনিধি পরিষদে গৃহীত হওয়ার পরের দিন ৪ আগস্ট ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনের মুখবন্ধ করার সময় তিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেন।

নিক্সনের ব্যাখ্যা

প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রতিনিধি পরিষদের পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন যে, এর ফলে পাকিস্তানের শক্তি 'গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত' হবে। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের বিবেচনায় সবচেয়ে গঠনমূলক যে ভূমিকা আমরা পালন করতে পারি তা হলো পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের অর্থনৈতিক সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং ঘটনার গতিধারা প্রভাবিত করতে সক্ষম থাকা। পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের ওপর কোনো প্রকাশ্য চাপ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি না আমরা। এটা হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফলা।'

নয়াদিল্লির কর্মকতারা মনে করেন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাম্প্রতিক বিশ্বজনীন চাল বিশেষভাবে কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর পদক্ষেপ—ওয়াশিংটনের কাছে ভারতের গুরুত্ব আরো কমিয়ে দিয়েছে। একজন বৈদেশিক পর্যবেক্ষক বলেছেন, নতুন সোভিয়েত–ভারত মৈত্রী চুক্তি কোনো বাস্তব ফলাফল দিক আর না দিক, 'ভারতীয়রা এটা মনে রাখবে যে প্রয়োজনের সময় রাশিয়ানরা তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের পরিত্যাগ করেছিল আমেরিকানরা।'

মার্কিন–ভারত সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে তা সংস্কার করার জন্য উভয় দিক থেকে এখন কোনো বড় উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এখানে সর্বজনস্বীকৃত মত হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে মেরামতি যাই করা হোক উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কখনোই আর আগের মতো হবে না। মার্কিন নীতিতে কোনো নাটকীয় পরিবর্তন অথবা একটি ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রশাসন হয়তো অবস্থা পাল্টে দিতে পারে কিন্তু তাহলেও আবেগপ্রবণ ভারতীয় স্মৃতি থেকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির ছাপ কখনোই সম্পূর্ণ মুছে যাবে না।

নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এবং ভারত–সোভিয়েত চুক্তি ও অন্যান্য বিষয় ব্যাখ্যার জন্য প্রধান প্রধান পশ্চিমা দেশ সফরকালে ওয়াশিংটনেও আসবেন। তখন হয়তো ওপর–ভাসাভাবে সম্পর্কোন্নয়নে কিছু কাজ করা হবে।

ডেটলাইন : কুঠিবাড়ি, ভারত
সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৭১

সৈন্যদের হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ অব্যাহত

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত সর্বশেষ শরণার্থী দল জানাচ্ছে যে, স্বাভাবিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাঙালি জনগণের আস্থা অর্জনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও পাকবাহিনী ও তাদের বেসামরিক সহযোগীরা হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত রেখেছে।

বিগত এক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে আসা এমনি কয়েক ডজন শরণার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন বর্তমান সংবাদদাতা এবং তাঁরা সবাই সৈন্যদের দ্বারা বেসামরিক নাগরিক হত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য ধরনের নিপীড়ন পরিচালনার বর্ণনা দিয়েছেন।

কলকাতা থেকে ৬০ মাইল উত্তর–পশ্চিমে এবং সীমান্ত থেকে প্রায় চার মাইল ভেতরে এই গ্রামে জল থকথকে, শরণার্থী–ওপচানো শিবিরে কথা বলার সময় সীমান্ত এলাকা থেকে গোলাবর্ষণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। পাকবাহিনী, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী দল, না কি বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী, কারা যে এই গোলা ছুঁড়ছে হলফ করে বলা মুশকিল।

যেসব শরণার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন ফরিদপুর থেকে, কারাবন্দী বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পৈতৃক জেলা এটি।

প্রায় সবাই হিন্দু

শরণার্থীরা জানায়, সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হলেও প্রাণনাশের শঙ্কা দেখা–না–দিলে তাঁরা থেকেই যেতেন। নবাগত উদ্বাস্তুদের প্রায় সবাই হিন্দু, তাঁরা জানান, সামরিক কর্তৃপক্ষ এখনও হিন্দুদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু করে রেখেছে।

তাঁরা আরো জানান, তাঁদের এলাকায়

গেরিলারা তৎপর রয়েছে এবং প্রতিটি গেরিলা হামলার পর বেসামরিক নাগরিকদের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালানো হয়।

ফরিদপুর জেলার এক চাল ব্যবসায়ী নিত্যপদ সাহা গেরিলাদের আহার ও আশ্রয়-প্রদানকারী তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী গ্রামের দুর্ভাগ্য বর্ণনা করেন। তাঁর দেশত্যাগের পাঁচদিন আগে পাক আর্মি গ্রাম আক্রমণ করে, প্রথমে গোলাবর্ষণ করে এবং পরে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, 'গ্রামবাসীদের কেউ কেউ চট্‌জলদি পালাতে পারে নি। সৈন্যরা তাদের ধরে হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে।'

শ্রী সাহা বলেন, গ্রামে ৫০০০ লোকের বাস ছিল, এদের বেশিরভাগই হিন্দু। গ্রামে এখন একটি বাড়িও অক্ষত নেই।

'বাজে কাজ' করছে অন্যরা

শরণার্থীদের মতে, সেনাবাহিনী যাবতীয় 'নোংরা কাজ' সম্পাদনের দায়ভার ছেড়ে দিয়েছে বেসামরিক সহযোগীদের ওপর। সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের সমর্থক দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় দল জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের সমর্থকদের তারা অস্ত্র প্রদান করেছে। রাজাকার বা হোমগার্ড্ এবং এইসব সশস্ত্র ব্যক্তি যাবতীয় 'নোংরা কাজের' দায়িত্ব পেয়েছে।

উদ্বাস্তুরা জানায়, গেরিলাদের সাহায্যকারীদের পরিচয়, তাঁদের বাড়ি ও গ্রাম চিনিয়ে দিতে দালালরা পাক আর্মির গোয়েন্দা এজেন্ট ও দক্ষিণহস্ত হিসেবে কাজ করছে। প্রায়শ দালালরা কোনো কারণ ছাড়াই লোকজনকে যথেচ্ছ গ্রেফতার করছে।

বরিশাল জেলার রেডিও মেকানিক দীপককুমার বিশ্বাস জানান, 'রাজাকার ও অন্যরা গ্রামে ঢুকে প্রথমে যে কোনো একটা বাড়ি বাছাই করে। এরপর তারা সেই বাড়িতে শক্ত-সমর্থ যাকেই পাবে ধরে নিয়ে পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেবে। এদের নিয়ে পাকবাহিনী কি করে আমার তা জানা নেই। তবে তারা আর কখনো ফিরে আসে না।'

শরণার্থীরা জানান, প্রতিশোধমূলক তৎপরতা ও কড়া নজরদারী সত্ত্বেও স্থানীয় জনগণ গেরিলাদের তথ্য, আহার ও আশ্রয় যুগিয়ে চলেছে।

ধানচাষী মাখনলাল তালুকদার জানালেন, কয়েকদিন আগে গ্রামের হাটে হঠাৎ চড়াও হয়ে ভিড়ের ওপর রাজাকারদের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের পর তিনি পালিয়ে এসেছেন। গুলিতে ছয়জন নিহত ও অনেকে হতাহত হয়।

শরণার্থী আগমন চলছে

পরিবারের আটজন সদস্যকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছেন শ্রী তালুকদার। তবে চলৎ-ক্ষমতাহীন বয়োবৃদ্ধ পিতাকে লুকিয়ে রেখে আসতে হয়েছে।

হাটের ঐ ঘটনার পর তাঁদের এলাকা থেকে প্রায় ১৫,০০০ লোক পালিয়ে ভারত চলে এসেছে বলে শ্রী তালুকদার জানান। প্রতিদিন ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ শরণার্থী ভারতে আসছে—যোগ দিচ্ছে ইতিমধ্যে এখানে আশ্রয়-গ্রহণকারী লক্ষজনের সঙ্গে, সর্বশেষ

হিসেবে যে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮.৬ মিলিয়ন।

পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান শরণার্থীদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রত্যাবর্তনকালে তাদের সর্বাত্মক সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি এবং গেরিলাদের জন্য ঘোষণা করেছেন সাধারণ ক্ষমা।

এইসব প্রতিশ্রুতি শরণার্থীদের মধ্যে তিক্ত হাসির উদ্রেক ঘটায়। অপর এক চাষী রাজেন্দ্র দাস বলেন, 'প্রাণ বাঁচাতে আমরা পালিয়ে এসেছি। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না।'

শরণার্থী এলাকাগুলোতে চালের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে, এর ফলে দাম বেড়ে গেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে অন্যান্য খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে বলে প্রকাশ। উদ্বাস্তুরা জানায়, অনেককেই উপোষ থাকতে হচ্ছে। কেননা তাঁদের কোনো কাজের সংস্থান নেই, হাতে টাকা নেই।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরুর পর থেকে অর্থনৈতিক জীবনে গভীর বিপর্যয় ঘটেছে। বিশেষভাবে কষ্টকর হয়ে উঠেছে খেতমজুরদের এবং সরকারি গণপূর্ত প্রকল্পের আওতাধীন শ্রমিকদের জীবন, কেননা এইসব কাজের বেশিরভাগই এখন বন্ধ রয়েছে।

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৭১

ভারতে শরণার্থী-শিশু : 'হাজারে হাজারে' মৃত্যু

অপুষ্টি এবং তজ্জনিত রোগের কারণে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থী–শিশু মৃত্যুবরণ করছে এবং গুরুতর অপুষ্টিতে ভুগছে লক্ষ শিশু, দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর কিনারে এসে। মৃত্যুহারের সঠিক হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না, কেননা শরণার্থী শিবিরের ভারতীয় কর্মকর্তারা শিশু–মৃত্যুর পৃথক খতিয়ান রাখেন না। তবে বিভিন্ন ক্যাম্পে সরেজমিন তদন্ত করে বর্তমান সংবাদদাতা এটা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন যে ১ থেকে ৮ পর্যন্ত নাজুক বয়েসের শিশুদের মধ্যে প্রতিদিন ঘটছে শত শত মৃত্যু। কোনো কোনো বিদেশী সাহায্যকর্মী মনে করেন মৃত্যুহার আরো অনেক বেশি। বৃটিশ সাহায্য সংস্থা অক্সফামের অভিজ্ঞ মাঠকর্মী অ্যালান লেদার জানান, 'হাজারে হাজারে শিশু মারা যাচ্ছে। এবং আমি মনে করি আরো লক্ষ শিশুর মৃত্যু হবে যদি না অবিলম্বে ব্যাপক আকারে শিশু–আহার কর্মসূচি শুরু হয়।'

নতুন কর্মসূচি অনুমোদিত

দুই মাসের দ্বিধা ও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার পর অপারেশন লাইফলাইন নামে এমনি এক কর্মসূচি সবে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে কতো দ্রুত এটা পুরো মাত্রায় চালু করা যায় তার ওপর। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন এটা করতে এক থেকে দুই মাস সময় লাগবে।

পাক সরকারের ছয় মাসব্যাপী সামরিক অভিযানের কবল থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে আসা ৯ মিলিয়ন বাঙালি শরণার্থীর বেশির ভাগ যেসব জিরজিরে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে তার সবগুলোতেই দেখা যায় দুঃস্থ শিশুদের করুণ চিত্র। কোনোক্রমে দাঁড় করানো ফিল্ড

হাসাপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে মৃত্যুপথযাত্রী শিশু, তাদের লিকলিকে শরীরের খাঁচার ওপর লেপ্টে আছে কুঁচকানো চামড়া। পাশে দাঁড়িয়ে হতবিহ্বল মায়েরা। একটুকরো কাপড় কিংবা শক্ত কাগজ দিয়ে বাতাস করছে সন্তানকে কিংবা চেষ্টা করছে যৎসামান্য খাবার খাওয়াতে যা আবার তৎক্ষণাৎ উগড়ে বমি করে ফেলছে শিশুরা।

'ও কী বাঁচবে ?', নড়তে-চড়তে, এমনকি কাঁদতেও অক্ষম দুই মাসের কঙ্কালসার এক শিশুকে দেখিয়ে একজন দর্শনার্থী জানতে চাইলো। ভারতীয় নার্স জবাব দিলেন, 'কোনো আশা নেই।' মায়ের চোখের নীরব ভাষায় সেই হতাশারই সমর্থন প্রকাশ পেল।

অপুষ্টির ব্যাপকতা

শরণার্থী শিবিরে এসে পৌছুবার সময়ও বহু শিশু অপুষ্টিতে ভুগছিল, কেননা স্বাভাবিক সময়েও পূর্ব পাকিস্তানে অপুষ্টির ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। শরণার্থীরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে ভারতের সেই সীমান্ত এলাকগুলোতেও পরিস্থিতি ভিন্নতর নয়। কিন্তু শরণার্থী শিবিরগুলোতে অপুষ্টির মাত্রা আরো তীব্র হয়েছে এখানকার গাদাগাদি ভিড়, পয়ঃনিষ্কাশনের দুর্বল ব্যবস্থা, দূষিত জল ইত্যাকার কারণে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে দীর্ঘ পথ হেঁটে আসার কারণে শরণার্থীদের দুর্দশা। ফলে উপমহাদেশে অপুষ্টির যে মাত্রা তার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থা শরণার্থী শিবিরগুলোর।

সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান অল ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের এক জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৫ বছরের কম-বয়েসী শরণার্থী-শিশুদের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রোটিন ও ভিটামিন ঘাটতিজনিত 'মোটামুটি তীব্র অথবা তীব্র অপুষ্টিতে' ভুগছে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অপুষ্টির সঙ্গে যোগ হয়েছে অন্যান্য রোগ ও সংক্রমণ, যেমন ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি। অনেক শিশুই একসঙ্গে তিন-চারটি রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে : এমন কি সাধারণ অসুখও এইসব বঞ্চিত শিশুর বাঁচা-মরার পাল্লা হেলিয়ে দেয়। নিরসনমূলক ব্যবস্থা জরুরিভাবে না নেওয়া হলে বিপুল সংখ্যক বাচ্চা ও শিশুর মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া এই শিশুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জড়বিকাশের সমস্যা দেখা দেওয়ার প্রশ্ন তো রয়েছেই।

দুই মাসের পুরনো রিপোর্টে

ভারত সরকারকে তৎপর করে তোলার ক্ষেত্রে এই রিপোর্টের বিশেষ অবদান রয়েছে বলা হলেও এটা লক্ষণীয়, আজ থেকে দু-মাস আগে সরকারের কাছে এটা হস্তান্তর করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, প্রায় ৩ লক্ষ শিশু 'জীবনমৃত্যুর এমন বিপজ্জনক প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, যেখানে কোনো ধরনের রোগ সংক্রমণ তাদের বেশিরভাগের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে।' প্রোটিন ও ক্যালরিযুক্ত সহায়ক খাবারের জরুরি কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে রিপোর্টে বলা হয় যে, সবকিছুর মূলে রয়েছে কত কম সময় নেওয়া হয় সেই প্রশ্ন। অন্যান্য পুষ্টি-বিশারদরাও সঙ্কটাপন্ন শিশুর সংখ্যা ৩ লক্ষ বলে উল্লেখ

করেছেন। তবে এই হিসেব করা হয়েছিল যখন শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। বর্তমানে প্রতিদিন যখন ৩০,০০০ উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করছে সেক্ষেত্রে আট বছরের কম বয়েসী শিশুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১.৭ মিলিয়ন বা ১৭ লক্ষ। আর এটাও মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে যারা শিবিরে বাস করছে তাদের সংখ্যা। ৯০ লক্ষ শরণার্থীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আশ্রয় শিবিরের বাইরে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে বাস করছেন। অধিকন্তু শিবিরবাসীদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ সন্তানসম্ভবা ও বুকের দুগ্ধদানকারী মাতা, যাঁদের জন্যও দরকার সহায়ক আহার্য কর্মসূচি।

কর্মসূচির দুই অংশ

২০ লক্ষ এমনি দুঃস্থপীড়িতদের জন্য মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের রিপোর্টে যে অপারেশন লাইফলাইন কর্মসূচির সুপারিশ করা হয়েছে তার রয়েছে সুস্পষ্ট দুটি অংশ। প্রথম অংশের নাম দেয়া হয়েছে আলফা, মূলত নিবারণমূলক উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো শিবিরগুলোতে ১০০০ বা ততোধিক ফিডিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা যা চরম পীড়িতদের গুঁড়ো দুধ ও উচ্চপ্রাণশক্তিসম্পন্ন খাবার যোগাবে। রিপোর্ট অনুসারে এর উদ্দেশ্য হলো, 'যেসব শিশু পুষ্টিজনিত ঘাটতির প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ছে তারা যেন আর অধিকতর তীব্র অপুষ্টির শিকার না হয় সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।' কিছু কিছু আলফা স্টেশন ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ, এখনও যা শুরু হয় নি, হচ্ছে কঠিন অসুস্থদের জন্য চিকিৎসামূলক কর্মসূচি বেটা। ৬,২৫,০০০ শিশুকে নিরাময় করে তোলার লক্ষ্যে এটি প্রণীত। এই উদ্দেশ্যে শিবির হাসপাতালের সঙ্গে ৫০০ পুষ্টিমূলক থেরাপি সেন্টার খোলা হবে, যেখানে জীবনরক্ষামূলক প্রয়াস হিসেবে অপুষ্টিজনিত জটিল রোগাক্রান্ত শিশুদের ভর্তি করে দরকার-মতো এক থেকে দুই মাস অবধি রেখে পরম সেবা প্রদত্ত হবে।

ইউনিসেফ-এর সহায়তা

গোটা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাবে ইউনিসেফ এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রদত্ত সাহায্য তহবিলের অর্থ দিয়ে এইসব সামগ্রী কেনা হবে। তবে প্রকল্প পরিচালনা করবে অন্যেরা, আলফা চালাবে স্বেচ্ছাসেবী রিলিফ সংস্থার সহযোগিতায় ভারতীয় রেডক্রস এবং বেটা পরিচালনা করবে ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়। প্রকল্প গ্রহণে বিলম্ব ঘটার অন্যতম কারণ হচ্ছে বেটা পরিচালনা নিয়ে পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে টানাহ্যাঁচড়া। তবে বিলম্বের প্রধান কারণ হচ্ছে যেখানে স্থানীয় জনসাধারণের ভেতরে প্রকট না হলেও একই ধরনের সব সমস্যা বিদ্যমান, সেখানে শুধু শরণার্থীদের জন্য সহায়ক আহার্য যোগানোর এমন একটি ব্যাপক কর্মসূচি প্রবর্তনে ভারত সরকারের অনীহা। শরণার্থী শিবিরে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে, বিশেষভাবে বর্ষার কারণে, ভারত সরকারের ওপর চাপ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা কর্মসূচি অনুমোদন করে। রিলিফ কর্মীরা সরকারকে এই আশ্বাস দিয়েছে যে অপুষ্টির কারণে গুরুতরভাবে পীড়িত স্থানীয় শিশুদের বেটা কেন্দ্র

থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, যেখানে ৯ মিলিয়ন শরণার্থীর প্রায় ৭ মিলিয়ন আশ্রয় নিয়েছে, একটি সাংবৎসরিক দুর্গত এলাকা, সম্ভবত এটি ভারতের চরম দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা।

উত্তেজনার প্রসার

স্থানীয় জনগণ ইতিমধ্যেই সোচ্চার অভিযোগ তুলছে শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত বিনামূল্যের রেশনের পরিমাণ নিয়ে— পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ দরিদ্রজনের এমনি খাবার কেনার সঙ্গতি নেই। স্থানীয় জনগণ ও শরণার্থীদের মধ্যে টেনশন বেড়ে চলছে। উদাহরণত শরণার্থী শিবিরগুলোতে সবরকম চিকিৎসা সমস্যা মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাক্তার না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাৎপদ এলাকা ও সীমান্ত রাজ্যগুলোতে আনুপাতিক হারে চিকিৎসক রয়েছে তার চেয়েও কম। অত্র অঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হার শিবিরগুলোর হারের মতোই উঁচু। পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু জেলায় ১৫ বৎসর বয়স হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে এক–চতুর্থাংশ শিশু।

শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি বাইরে থেকে যেমন দেখা যায় বাস্তব অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। পরিসংখ্যান পাওয়া যায় খুব সামান্য। যেটুকুই–বা পাওয়া যায় সেটা ক্যাম্প হাসপাতাল থেকেই মেলে। এর বাইরেও অস্থায়ী আচ্ছাদনের অন্ধকার কোণে বহু শিশুর মৃত্যু ঘটছে এবং তাদের বাবা–মায়েরা এমন মৃত্যুর খবর নথিবদ্ধও করে না, কেননা তা করা মানেই একজনের বরাদ্দকৃত রেশন হারানো।

তাছাড়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী জ্বর বা ডায়রিয়ায় শিশু যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সাগু ও বার্লি জলে মিশিয়ে পথ্য হিসেবে খাওয়ানো হয় এবং কোনোরকম শক্ত খাবার তাকে দেওয়া হয় না। এর অর্থ অপুষ্ট শিশুর যখন খাবারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তখন তাকে দেওয়া হয় সবচেয়ে কম খাবার।

শীতকাল এলে শিবিরে দুর্গতি আরো বাড়বে। কম্বল প্রয়োজন অন্তত ৩ মিলিয়ন, এ–পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে খুব সামান্যই। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেলেও শরণার্থী আগমন বেড়ে যাবে। কর্মকর্তারা অনুমান করছেন সীমান্তবর্তী জেলাগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর নতুন শরণার্থীদের আগমন ঘটবে দেশের অনেক ভেতর থেকে, তার অর্থ যে ৯ মিলিয়ন শরণার্থী এ–পর্যন্ত এসেছে তাদের চেয়ে দীর্ঘতর পথ অতিক্রম করে দুর্বলতর অবস্থায় এসে পৌঁছুবে নবাগতরা। বিগত সপ্তাহগুলোতে যেসব শরণার্থী এসেছে তাদের বেশির ভাগই দূরবর্তী জেলার লোক। কলকাতার কাছাকাছি এক শিবিরের শিশু হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, 'এদের অনেকে এমন অবস্থায় এখানে এসে হাজির হয়েছে যে আর কিছু করার নেই—অত্যন্ত সঙ্গিন অবস্থা তাদের। আমাদের আর কিছু করার থাকে না।'

ফরেন অ্যাফেয়ার্স : অক্টোবর, ১৯৭১

বিভক্ত পাকিস্তান

ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ক্ষমতার ভারসাম্য ও নির্বাচনী ফলাফল সবকিছু মিলেই গড়ে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট। তবে এই রক্তক্ষয়ী উত্তালতা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কেবল, একজন কূটনীতিক যেমন বলেছেন, 'উপমহাদেশের বিকারতত্ত্বের নিরিখে'। ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন দমন করার জন্য পাকবাহিনী যখন পূর্ব পাকিস্তানে আকস্মিক অভিযান শুরু করলো তখন থেকেই ন্যায়বিদ্যা ও যুক্তির স্বাভাবিক মান অচল হয়ে পড়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্মমতা এটাই প্রকাশ করছে, যে-কোনো মূল্যে ও যে-কোনো উপায়ে হলেও সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখবে। অপরদিকে এই নির্মমতা থেকে জাত ও পরিপুষ্টিপ্রাপ্ত জনসমর্থনধন্য গেরিলা প্রতিআক্রমণ ক্রমেই কার্যকর হয়ে উঠছে। বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে পাকবাহিনীর প্রতিটি প্রতিশোধমূলক অভিযান জন্ম দিচ্ছে নতুন বাঙালি মুক্তিযোদ্ধার। ক্রুদ্ধ, তিক্ত, বিষণ্ন ও ঘৃণাপোষণকারী বাঙালিরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ লড়াইয়ে এখন প্রস্তুত বলেই মনে হয়। এর থেকে কম কোনো কিছু, যেমন পূর্ববর্তী লক্ষ্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জন, আজ অচ্ছুৎ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

অনেক পশ্চিমা কূটনীতিক বন্দী পূর্ব পাকিস্তানি নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রকৃত সমাধান অর্জনের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। তবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছেন যে, অধুনা নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ

মুজিবের রুদ্ধদ্বার বিচার অনুষ্ঠিত হবে এবং চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। এসবই লিখিত বক্তব্য, কোনো সিদ্ধান্ত এখনো ঘোষিত হয় নি।

ইতিমধ্যে ৭৫ মিলিয়ন অধিবাসীর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৭ মিলিয়নেরও অধিক শরণার্থী সেনা-সন্ত্রাসের কবল থেকে রক্ষা পেতে ভারতে পালিয়ে এসেছে। গণ্ডগোলের কারণে হেমন্তে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তবে আরো বহু লোক দেশত্যাগ করতে পারে। উদ্বাস্তুরা ভারতের জন্য কেবল বিপুল অর্থনৈতিক বোঝা নয়, একটি ভয়াবহ রাজনৈতিক শঙ্কাও তাঁরা বহন করছে—ভারতের অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খল পূর্বাঞ্চল, কয়েক বছর আগেই যে অঞ্চলের ওপর দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটেছে, সেখানে চেপে বসছে লাখ লাখ গৃহহীন, কর্মহীন মানুষ এবং যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই হচ্ছে পাকবাহিনীর আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত—এই সঙ্কট তাই সকল ভারতীয়ের মনে ১৯৪৭ সালের রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। ঐ দাঙ্গার পরিণতিতে উপমহাদেশ খণ্ডিত হয়ে মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-অধ্যুষিত কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অভ্যুদয়। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক নিপীড়ন ভারতীয়দের চোখে শুভের বিরুদ্ধে অশুভের চক্রান্ত হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তানের নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারি ঘুরিয়ে চলছে, অনেকবারই ঘটে গেছে সীমান্ত-সংঘর্ষ এবং হুমকি সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি যুদ্ধের, স্পষ্টতই যে যুদ্ধের প্রভাব পড়বে বিশ্বব্যাপী।

এই ঘটনার সঙ্গে যে প্রভূত আবেগ জড়িয়ে রয়েছে—স্পষ্টতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক বিদেশী রাষ্ট্র অজ্ঞাত কারণে তার যথাযথ স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন ওয়াশিংটন এখনো রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করে চলেছে, অথচ সংশ্লিষ্ট কোনো কূটনীতিক অথবা বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবতে পারছেন না। ওয়াশিংটন পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখছে এই যুক্তিতে যে, এর ফলে অনুগ্র সমাধান অর্জনে চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার তার হাতে থাকছে। ওয়াশিংটনের এই তথাকথিত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পাকিস্তানে প্রজ্বলিত আবেগের বৈপরীত্য পর্যবেক্ষকদের চোখে বেশ স্পষ্ট।

সামরিক শাসনের অবসান, প্রদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ বন্ধ এবং যথেষ্ট মাত্রায় স্বশাসন অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত তাদের আন্দোলনকালে বাঙালিরা পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়েছে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি পায়ে মাড়িয়েছে এবং সেনা বাহিনীকে কটাক্ষ করেছে। তারা আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও বিপ্লবী কাজও করেছে—যেমন সামরিক শাসন বয়কট এবং মার্চে কার্যত তাদের নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের কাছে আবেগী ও প্রতীকী অপমানগুলোই ছিল অধিক জ্বালাধরা। একজন মার্কিন কূটনীতিক বলেছেন, 'পতাকা, ইসলামি ঐক্য, জিন্নাহ ও সেনাবাহিনী নিয়ে গর্ব— এসব তাদের কাছে পরম ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন। এর অবমাননা তাদের ক্রুদ্ধ করে তোলে।'

২.
সংক্ষেপে, বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কেন তাদের সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিল তার বড় কারণ ছিল পবিত্র যুদ্ধের ভাবনার সঙ্গে জড়িত উন্মত্ততা। এটা বুঝতে কষ্ট হবে না যদি আমরা স্মরণ করি যে, পাকিস্তান হচ্ছে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, যেখানে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং জনগণের ইচ্ছা বারংবার পদপিষ্ট হয়েছে। সেই প্রথম রাতে পাক আর্মি যখন ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছিল, তারা সেটা উপভোগ করছিল বলেই মনে হয়েছে। নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করে গলির ভেতর থেকে পাঞ্জাবি সৈন্যরা যখন বের হয়ে আসছিল, তারা দু'হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে স্লোগান দিয়েছে 'নারায়ে তাকবির' (সৃষ্টিকর্তার জয়), 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' (পাকিস্তানের জয়)।

বর্তমান সংঘর্ষের একটি মৌল উপাদান হচ্ছে জাতিগত ঘৃণা—১০০০ মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা পৃথকীকৃত পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণ নৃতাত্ত্বিকভাবে বিভক্ত বহু শত্রুভাবাপন্ন দেশের জনগণের মধ্যেকার ফারাকের চাইতেও আলাদা এবং তারা এখন শত্রুপক্ষই বটে। তারা কথা বলে দুই ভিন্ন ভাষায় (পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু, পুবে বাংলা), তাদের আহারাদি ভিন্ন (পশ্চিমে মাংস-রুটি, পুবে ভাত-মাছ) এবং তাদের রয়েছে বিপরীত সংস্কৃতি : পাঞ্জাবিরা শক্ত-সমর্থ ধরনের, পছন্দ করে প্রশাসন ও সৈনিকবৃত্তি, পক্ষান্তরে বাঙালিরা আবেগপ্রবণ, ভালোবাসে সাহিত্য ও রাজনীতি। ফিকে-বর্ণ দীর্ঘদেহী পশ্চিম পাকিস্তানিদের শেকড় প্রোথিত মধ্যপ্রাচ্যে, বাঙালিদের সঙ্গে যোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হালকা-পাতলা বাদামী জনগোষ্ঠীর। তাদের মধ্যেকার একমাত্র অভিন্ন উপাদন হচ্ছে ধর্ম, ইসলাম, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন অবসানে দুই পক্ষ-বিশিষ্ট অবাস্তব জাতিগঠনের যা ছিল নড়বড়ে ভিত্তি।

পাকিস্তান সরকারের ওপর যাদের আধিপত্য সেই পাঞ্জাবিদের সঙ্গে বাঙালিদের নৃতাত্ত্বিক ফারাক ১৯৪৭ সালেও বহাল ছিল, কিন্তু তখন ধর্মভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের উন্মাদনায় সেটা চাপা পড়ে যায়। পরবর্তী দুই দশকে এইসব ফারাক আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে পূর্ব অংশের ওপর পশ্চিমের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শোষণের ফলে। যদিও পশ্চিমের ৬৯ মিলিয়ন মানুষের তুলনায় পূর্বের ৭১ মিলিয়ন মানুষ সংখ্যায় গরিষ্ঠ—তথাপি পশ্চিম, যেখানে সরকারের কেন্দ্রীয় অবস্থান, বরাবর পেয়ে এসেছে উন্নয়ন তহবিল, কলকারখানা, গণপূর্ত প্রকল্প, বৈদেশিক সাহায্য, আমদানি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাদির সিংহভাগ।

পূর্বাঞ্চলে পণ্যের মূল্য বেশি, আয় কম। পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও অন্যান্য রপ্তানি থেকে আসে পাকিস্তানের বৈদেশিক উপার্জনের অর্ধেকেরও বেশি। পশ্চিমাঞ্চলের কলকারখানা চালু রাখার কাঁচামাল আমদানি হয় এই অর্থ দিয়েই। পূর্ব পাকিস্তান আবার পশ্চিমের উৎপাদিত পণ্যের প্রধান বাজার, বিশেষত নিম্নমানের সুতিবস্ত্রের। বিশ্বের আর কোথাও যার বাজার মিলবে না, এখানে সেটাই সরকার-নির্দিষ্ট উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগ যে তাদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশিক শোষণ এক প্রবংশ আগের বৃটিশ শোষণের চাইতেও নিকৃষ্ট। তিক্ততা চরম পরিণতি অর্জন করেছে

দুটো ঘটনার ভেতর দিয়ে। প্রথমটি হলো গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও সরকারের গা–ছাড়া রিলিফ প্রচেষ্টা, বাঙালিদের দুর্ভাগ্যের প্রতি পশ্চিমাদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের স্বরূপ যা নাটকীয়ভাবে তুলে ধরলো। এক মাস পরে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক স্বশাসন দাবিকারী আওয়ামী লীগের নির্বাচনী–প্রচারে এটা বাড়তি ভোট যুক্ত করলো।

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল খোদ নির্বাচন—পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম সর্বজনীন ও স্বাধীন ভোট গ্রহণ। এই নির্বাচন সম্ভব করে তোলার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। ১৯৬৯ সালের মার্চে আইয়ুব খানের দশকব্যাপী শক্ত শাসনের অবসান ঘটেছিল রক্তাক্ত দাঙ্গা ও প্রতিবাদ আন্দোলনে এবং বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা ছিল ক্ষমতা অধিগ্রহণকারী ইয়াহিয়া খানের অন্যতম প্রতিশ্রুতি।

অধিকাংশ কূটনীতিক এই প্রতিশ্রুতি পালনে ইয়াহিয়ার আন্তরিকতার স্বীকৃতি দেন। কেউ কেউ এখনো মনে করেন সর্বময় ক্ষমতা যদি তাঁর হাতে থাকতো তবে সেনা–নিপীড়ন ঘটতো না। পাকিস্তানে প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় কয়েকজন জেনারেলের সমন্বয়ে গঠিত এক জুন্টা দ্বারা, এদের অধিকাংশই হচ্ছে কঠোর উগ্রবাদী। জেনারেল ইয়াহিয়া সর্বাধিনায়ক হলেও এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এটা ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে, জেনারেলরা এই ভেবে নির্বাচন অনুষ্ঠান সমর্থন করেছিলেন যে অর্জিত ফলাফল তাদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার প্রতিকূলে যাবে না। অনেক পশ্চিমা কূটনীতিকের মতো তারাও মনে করেছিলেন যে যদিও পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ভালো ফলাফল দেখাবে তাহলেও সেনাবাহিনীর সমর্থক দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় দলগুলো দেশের উভয় অংশে যথেষ্টসংখ্যক আসন পাবে যা দিয়ে তারা সংখ্যাধিক্যের জোরে সরকার পরিচালনা করতে পারবে।

কিন্তু ঘূর্ণিঝড় পাল্টে দেয় এই ভবিতব্য। পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র দুটি বাদে সব আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ, জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের (ইয়াহিয়ার আরেকটি ছাড়) কারণে এর ফলে তারা অর্জন করে জাতীয়ভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বাঙালিদের কেউ কেউ মনে করেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই জেনারেলরা সামরিক সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আসল ব্যাপার সম্ভবত কখনোই জানা যাবে না। যাই হোক না কেন, ঝড়ের কালো মেঘের আনাগোনার শুরু তখন থেকেই।

পশ্চিম পাকিস্তানের অগ্রণী রাজনৈতিক গ্রুপ পাকিস্তান পিপল্স পার্টি দাবি তুলতে শুরু করে যে, আওয়ামী লীগ তাদের স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি কাটছাঁট করুক। কিন্তু শেখ মুজিব— তাঁর সমর্থক উগ্রপন্থী ছাত্র–শ্রমিকদের চাপের মুখে এবং সম্ভবত সামরিক রক্তপাত ঘটবার বিপদ সম্পর্কে কাঁচা ধারণা থেকে— আপসরফায় রাজি ছিলেন না। তাঁর ভয় ছিল সেটা করলে পশ্চিম পাকিস্তানি ক্ষমতাগোষ্ঠী কোনো–না–কোনোভাবে বাঙালিদের ঠকিয়ে ন্যায্যভাবে অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করবে।

এরপর পাকিস্তান পিপল্স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় সংসদের আশু অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। নতুন সংবিধান রচনার জন্য ৩ মার্চ এই অধিবেশন বসার কথা ছিল এবং আকস্মিকভাবে ইয়াহিয়া তা স্থগিত ঘোষণা করেন। পূর্ব

পাকিস্তান জুড়ে প্রতিবাদ ও সংঘর্ষের ঢেউ বয়ে যায়, বাঙালি জনসমাবেশের ওপর যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনী, হতাহত হয় বহুজন এবং এরপর সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করে শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা এর জবাব দেয়। আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করে এক ধরনের কার্যত আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠায়। পাকিস্তান সরকার তখন রাতের অন্ধকারে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে। ১৫ মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া স্বয়ং ঢাকায় আসেন। অধিকাংশ বাঙালি এবং কিছু কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষকও এখন মনে করেন আক্রমণের জন্য যথেষ্টসংখ্যক সৈন্য চালান করার মতো সময় নেওয়ার জন্যই আলোচনার অছিলা তৈরি করা হয়েছিল। সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত ঠিক কখন গৃহীত হয়েছিল সেটা জানা যায় না, তবে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি থেকে এই ইঙ্গিত মেলে যে এটা শেষ মুহূর্তে নেওয়া হয় নি।

সে যাই হোক, আলোচনা যখন অব্যাহত ছিল তখন ২৫ মার্চ রাতে ট্যাঙ্ক, রকেট ও অন্যান্য ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকবাহিনী ঢাকায় প্রায় সর্বাংশে বেসামরিক জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও তারা দরিদ্র জনগণের গোটা বসতি ধূলিসাৎ করে দেয়। পরবর্তী দিন ও সপ্তাহগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা গোটা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে, একই ধরনের নির্মম অভিযান চালিয়ে জনবসতিগুলো তছনছ করে দেয়।

এই লেখার সময় পর্যন্ত, বিদেশী কূটনীতিকদের হিসেবে, সেনাবাহিনী অন্ততপক্ষে ২০০,০০০ বাঙালিকে হত্যা করেছে। প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এমন দাবি সত্ত্বেও সেনাবাহিনী এখনও আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এমন কি সরকারি প্রশাসনের কোনোরকম কাঠামো দাঁড় করাতে সমর্থ হয় নি। অপরদিকে ভারত প্রদত্ত সাহায্য, প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ভগ্নদশা অব্যাহত রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও তা সঙ্কট সৃষ্টি করছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে জখম ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে এবং একটি ক্ষুদ্র দালাল গোষ্ঠী (অধিকাংশই বিহারিদের মতো অবাঙালি মুসলমান ও দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় দলের বাঙালি সমর্থক) ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক জনগণ বৈরী, পোড়খাওয়া এবং অবিচলিত।

যুক্ত পাকিস্তানের ধারণার কবর হয়েছে। সামরিক শাসকরা একটি উপনিবেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে ধরে রাখতে পারবে শুধু জবরদস্তি, সন্ত্রাস ও বর্বর পুলিশি রাষ্ট্র ব্যবস্থা অবলম্বন করে। অব্যাহত সামরিক নিপীড়নের নিরর্থকতা সম্পর্কে পাকিস্তানি জেনারেলদের মধ্যে কোনো উপলব্ধির লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। কারো কারো ধারণা—যদিও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে— পূর্ব পাকিস্তানে বাস্তবে কি ঘটছে সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবহিত করা হচ্ছে না। এদিকে শাসকগোষ্ঠীর অন্যান্য কাজকর্ম আস্থা ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে ঘৃণা ও অবিশ্বাস বাড়াতেই পরিকল্পিত হয়েছে বলে মনে হয়। বাংলা ভাষার ব্যবহার সঙ্কুচিত করা হচ্ছে, পাল্টানো হচ্ছে রাস্তার নাম, দায়িত্বশীল সরকারি পদ থেকে বাঙালিদের অপসারণ ঘটছে এবং গ্রামে অথবা ভারতে পালিয়ে গেছে যেসব বাঙালি তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট দালালদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে।

সংঘর্ষ যতো প্রলম্বিত হবে, বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন— আদর্শ-উদ্বুদ্ধ নয় বরং যা হচ্ছে জাতীয়দাবাদী অভ্যুত্থান— তার চরিত্র বদল ঘটে মাওবাদী উগ্রপন্থী নেতৃত্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা ততো বাড়বে। কতক চীনাপন্থী মুক্তিযোদ্ধা পূর্ব পাকিস্তানে সক্রিয় রয়েছে। বিদেশী শক্তিগুলোর জন্য এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের এক বলয় গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন, যার বিস্তৃতি ভারতে ইতিমধ্যে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়িয়ে বার্মা হয়ে ভিয়েতনাম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

ভারতের জন্য ঘটনার প্রভাব বিশেষ জটিল। গত মার্চ মাসে 'গরিবি হটাও' কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিপুলভাবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছিলেন—কিন্তু লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থীর থাকা-খাওয়ার ব্যয় মেটাতে গিয়ে কার্যত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে আছে। ভারতকে এখন এমন এক পথ মাড়াতে হচ্ছে যা বর্ধমান বেকারত্ব, অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তীব্র দারিদ্র্যসম্পন্ন দেশের জন্য বিশেষ বিপজ্জনক।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, এমনি চরম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনগণ ও রাজনীতিবিদদের চাপ এ-যাবৎ শ্রীমতী গান্ধী ঠেকিয়ে আসছেন। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা হয়তো ভয় পাচ্ছেন যে, বিদ্যমান আবেগ-উত্তেজিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানকে তা যুদ্ধ-ঘোষণায় প্ররোচিত করতে পারে। শ্রীমতী গান্ধী এটা পরিহার করতে অত্যন্ত উদগ্রীব। কিন্তু স্বীকৃতিদানের জন্য চাপ ক্রমশ বাড়ছে এবং শ্রীমতী গান্ধী হয়তো শেষ পর্যন্ত জনমতের প্রতি অনুগত হওয়াটাকেই প্রয়োজনীয় মনে করতে পারেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্তে ভারত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তার দিক থেকে সংঘর্ষের পথে পদক্ষেপ না নেওয়াটাই অনুসৃত নীতি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সংক্ষেপে, তৃতীয় ভারত-পাক যুদ্ধের অজুহাত সে সৃষ্টি করতে চাইছে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের জন্য অব্যাহত সামরিক সাহায্য ও নিরাপদ আশ্রয় প্রদান পরিহার করাটা তার লক্ষ্যের মধ্যে নেই। ফলে যুদ্ধের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বাঙালি গেরিলা এলাকা প্রতিষ্ঠায় ভারত যদি সহায়তা করে, তবে তার সরকার এটাকে পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করবে। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, তেমনটা হলে 'আমি পুরোপুরি যুদ্ধ ঘোষণা করবো এবং বিশ্ব একথা জেনে রাখুক।' অধিকন্তু, বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়ে ভারত এক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা বহাল রাখছে এবং এর মাধ্যমে অব্যাহত রাখছে শরণার্থী আগমনের প্রবাহ, যা তার অর্থনীতি ও সামাজিক আবহের ওপর চাপ জোরদার করছে।

ভারতের একটি বড় শঙ্কা এবং পাকিস্তানের জন্য ভরসা যে, বাদবাকি বিশ্ব সমস্যাটিকে আরেকটি ভারত-পাক সঙ্কট হিসেবে বিবেচনা করবে এবং এর দ্বারা প্রকৃত সমস্যা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরে যাবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধংদেহী কথাবার্তা, ভারতের বিবেচনায়, দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়ার এমনি এক কৌশল এবং সম্ভবত বাঙালি গেরিলাদের ক্রমবর্ধমান সাফল্যে দুর্বলচিত্ত প্রতিক্রিয়া।

তবে কোনো কোনো ভারতীয় বিশ্লেষক মনে করেন, এমনি পটভূমিকায় পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ একান্ত সম্ভবপর। তাঁদের মতে, গেরিলাদের সঙ্গে লড়াইয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হেরে গেলে পাকিস্তানি জেনারেলদের মুখ দেখাবার জো থাকবে না এবং এটা পশ্চিম পাকিস্তানেও স্বায়ত্তশাসনকামী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অভ্যুত্থানকে উৎসাহিত করতে পারে। বেলুচ, পাঠান, এমনি বিভিন্ন জাতি পাঞ্জাবি আধিপত্য নিয়ে বাঙালিদের মতোই ক্ষিপ্ত। তবে, এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যদি ভারতের সঙ্গে পবিত্র যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে হারাতে হয়, তবে পরাজয়ের নানা কারণ তারা দেখাতে পারবে এবং ভারত-বিরোধী ঘৃণার গদে পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র জুড়ে রাখতে পারবে।

ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হলে বৃহৎ শক্তিবর্গ—যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট চীন নিস্পৃহ দর্শক হয়ে থাকতে পারবে না, তবে কতোটা গভীরভাবে তারা কোনো এক পক্ষে জড়িয়ে পড়বে, সেটা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। মোটামুটিভাবে লাইন-আপ এখন যেমন রয়েছে, তা হলো : চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করছে ভারতকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করে একদিকে শরণার্থী বাবদ ভারতকে বড়রকম সাহায্য দিচ্ছে, অন্যদিকে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখছে, যা, ওয়াশিংটনের মতে, ইসলামাবাদ সরকারের সঙ্গে সংলাপ চালানো ও চাপ প্রয়োগের একটি উপায়।

১৯৬২ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আড়ষ্ট হয়ে আছে। পক্ষান্তরে বিগত কয়েক বছরে চীন হয়ে উঠেছে পাকিস্তানের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী ও বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম মিত্র। ভারত-পাক যুদ্ধ বাধলে চীন সামরিক হস্তক্ষেপ করবে কি-না, সেটা জানা নেই, তবে ইসলামাবাদের কূটনীতিক মহলের খবর অনুযায়ী বাঙালি-সঙ্কট শুরুর পর থেকে পাকিস্তানে চীনা সামরিক সাহায্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে বদলি সৈন্য হিসেবে পাঠানোর জন্য অন্তত একটি নতুন পাকিস্তানি ডিভিশনকে অস্ত্রপাতি যোগানোর চুক্তি চীন করেছে। (এইসব কূটনীতিকের মতে, তবে চীন এখনো প্রকাশ্যে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সম্পর্কে নিন্দাবাদ করে নি এবং তাঁরা মনে করেন না পাকিস্তানের প্রতি পিকিং-এর বর্তমান সহায়তা ভবিষ্যতে বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থনদানে কোনো বাধা হতে পারে)।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সম্প্রতি যখন বলেছিলেন যে, যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তান ‘একা’ থাকবে না, তখন তিনি সম্ভবত পিকিংকে বুঝিয়েছিলেন। ভারতীয় সংসদে সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং জবাব দিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে ভারতও একা থাকবে না। অনুমান করা যায় তিনি রাশিয়ার কথা বলছিলেন। ষাটের দশক জুড়ে মস্কো যদিও ভারতকে যেমন সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছিল, তেমনি পাকিস্তানকেও অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। তবে বিগত কয়েক বছরে মূলত ভারতের আপত্তির কারণে সেই সাহায্য একেবারেই কমে এসেছিল। মস্কো পাকিস্তানকে পুরোপুরি চীনের হাতে ছেড়ে দিতে চায় নি এবং সাম্প্রতিক সঙ্কটের সময় অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ বা এমনি কোনো চরম পদক্ষেপ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নেয় নি। তবে পাকিস্তানের ওপর বড় রকম বাজি রুশিরা ধরে নি, ২০ বছরের ভারত-

রুশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর স্পষ্টতই দেখিয়েছে যে, রুশিরা ভারতকেই তাদের মিত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে।

৩.

সঙ্কটকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেয়ালের ওপর বসে কালক্ষেপণ করছে এবং তাদের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী নজর ও সমালোচনা আকর্ষণ করেছে। ভারতে এটা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং মার্কিন–ভারত সম্পর্ক যথেষ্ট নিম্নগামী হয়েছে। মনে হচ্ছে ওয়াশিংটন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল জাগরণকে ঘনিয়ে–আসা ভারত–পাক সংঘর্ষ থেকে আলাদা করে দেখা অসম্ভব এবং সাহায্য বন্ধ করা বা সামরিক পীড়নের প্রকাশ্য নিন্দা জ্ঞাপনের মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা উল্টো ফল বয়ে আনবে। উপমহাদেশে ভারতের বিপক্ষে 'ভারসাম্য' হিসেবে পাকিস্তানকে বিবেচনা করার ধারণার প্রতি ওয়াশিংটন এখনও অনুগত রয়েছে বলে মনে হয়। পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণ মার্কিন অর্থলগ্নিকে বিসর্জন দিতে অনীহারও প্রকাশ রয়েছে এতে। সর্বোপরি এটা মেনে নিতে আপত্তি রয়েছে যে, পাকিস্তানকে ব্যাপক সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের পুরনো নীতি মোটামুটি ব্যর্থ হয়েছে—এই সাহায্য শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে, বাঙালিদের তিক্ততা বাড়িয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত, আদর্শ মার্কিন–পাক সম্পর্কের দশকে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত করেছে আমেরিকা এবং পশ্চিমপন্থী, কমিউনিস্ট–বিরোধী সামরিক জোট সিয়াটো ও সেন্টোর সদস্য হয়েছে সে দেশ। এই সময়সীমায়— যখন রুশ ও চীনাদের নিয়ে পাকিস্তানের সমস্যা ছিল— আমেরিকা পাকিস্তানকে শুধু সামরিক সাহায্যই দিয়েছে ১.১৭ বিলিয়ন ডলারের (তবে এই সংখ্যা আরো কম হতে পারে)। অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া হয়েছিল আরো অনেক বেশি।

১৯৬৫ সালের পর সম্পর্কে নাটকীয় শীতলতা নামে। অনেক কারণেই এটা ঘটেছে: ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ পাকিস্তানকে চীনের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল; ১৯৬৪ সালে আরোপিত মার্কিন অস্ত্র সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা ছিল আরেক কারণ যে সরবরাহের ওপর ভারতের চেয়ে পাকিস্তান বেশি নির্ভরশীল ছিল এবং অস্ত্রখাতে যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে চীন ও রাশিয়ার আগ্রহ এখানে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৬৭ সালে ওয়াশিংটন অস্ত্র সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা আংশিক তুলে নেয় এবং মারাত্মক নয় এমন অস্ত্র, খুচরো যন্ত্রাংশ ও পূর্বে সরবরাহকৃত অস্ত্রের গোলাগুলি বিক্রয় অনুমোদন করে।

২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আক্রমণ অভিযান শুরুর পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের ওপর নতুন করে বিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে এবং জানায় যে কোনো সামরিক সরবরাহ বর্তমানে পাইপলাইনে নেই। কিন্তু জুনের শেষাশেষি সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, মার্কিন বন্দর থেকে পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র চালান অব্যাহত রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথমে একে আমলাতান্ত্রিক ভুলচুক বলে অভিহিত করে, কিন্তু পরে এই ব্যাখ্যা বাতিল করে জানায় যে, অস্ত্র চালান সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, কেননা, এসবের জন্য চুক্তি ২৫ মার্চের আগে করা হয়েছিল এবং এই চালান অব্যাহত

থাকবে। এইসব চালান রোধে কংগ্রেসের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ওয়াশিংটনের ওয়াকেবহাল সূত্রে প্রকাশ, এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করেছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নিক্সন।

ইতিমধ্যে মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষায় 'বিবেচনাধীন')। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় যে, পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগের উপায় হিসেবে সাহায্য প্রদানে অস্বীকৃতি আমেরিকা জানাবে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশ্বব্যাঙ্কের ১১-জাতি এইড-টু-পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য সদস্যের কঠোর মনোভাবের বিরুদ্ধে একলা-চলা-নীতি অনুসরণে ওয়াশিংটনের অনিচ্ছুক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে সাহায্য স্থগিত করার ক্ষেত্রে। জুনে এক বিশেষ বিশ্বব্যাঙ্ক রিপোর্টে বলা হয় যে, সেনাবাহিনীর অভিযান পূর্ব পাকিস্তানকে এতো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা 'সামান্যই কাজে আসবে' এবং 'অন্তত এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে তা স্থগিত অবস্থায় রাখতে হবে'। কনসোর্টিয়াম সাহায্যের ওপর পাকিস্তান বড়ভাবে নির্ভরশীল, যার পরিমাণ বার্ষিক ৪৫০ মিলিয়ন ডলার (এর মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয় ২০০ মিলিয়ন ডলার)। স্বীয় বিশ্ব-ভাবমূর্তি উদ্ধার ও বিদেশী সাহায্য পুনরায় চালু করতে অধীর (বৈদেশিক মুদ্রা-সঞ্চয় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসছে) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ১০০ জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনে সম্মত হয়েছেন। তাঁদের কাজ হবে পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে সাহায্য করা এবং ভারত থেকে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে সহায়তা দান।

ভারতের মাটিতেও এমনি পর্যবেক্ষক দল মোতায়েনের জন্য জাতিসংঘ বলেছিল কিন্তু ভারত ক্রুদ্ধভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস বন্ধ না হলে শরণার্থী প্রবাহ রুদ্ধ হবে না এবং ভারতে পর্যবেক্ষক বসিয়ে সেই কাজ সিদ্ধ হবে না। ভারত শরণার্থীদের দেশে ফেরা বাধাগ্রস্ত করছে, পাকিস্তানের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রচারণা বলে ভারত বাতিল করে দিয়েছে। বস্তুত তাদের প্রত্যাবর্তন কামনা করার অজস্র কারণ ভারতের রয়েছে। পর্যবেক্ষক সংক্রান্ত প্রস্তাবে ভারত পুরনো জুজু দেখতে পাচ্ছে—সঙ্কটকে যে ক্ষেত্রে নিছক ভারত-পাক সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং সমস্যার সমাধানে ভারত ও পাকিস্তানের ওপর সমদায়িত্ব অর্পিত হয়। ভারত এটাও উল্লেখ করেছে যে, পর্যবেক্ষক গ্রহণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সম্মতি প্রদত্ত হয়েছে তখনই, যখন পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলা তৎপরতা ও তার কার্যকারিতার লক্ষণীয় প্রসার ঘটেছে।

জাতিসংঘ দলের উপস্থিতি পাকবাহিনীর সন্ত্রাস ও প্রতিশোধস্পৃহা রোধে ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এর ফলে কিছু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হতে পারে। সেদিক থেকে এটা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে বর্তমান লেখক ও অন্যান্য বিদেশী পর্যবেক্ষক শরণার্থী শিবিরগুলো ব্যাপকভাবে ঘুরে আলাপ-আলোচনা করে অনুভব করতে পেরেছেন যে, বেশিরভাগ শরণার্থীই ফিরে যাবেন না। কেননা একদিকে তাঁদের বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি দালালদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে শরণার্থীদের বৃহদংশ হিন্দু জনগোষ্ঠী সেনাবাহিনীর হত্যালীলার পর পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার চাইতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতেই বেশি নিরাপদ বোধ করবেন।

তদুপরি, জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি গেরিলা তৎপরতা বন্ধ করতে পারবে না, এর ফলে অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা বহালই থাকবে যদি না সেনাবাহিনী [সীমান্ত এলাকা থেকে : অনুবাদক] প্রত্যাহার করা হয়। তবে সে ক্ষেত্রে গেরিলাদের প্রতি ভারতীয় সাহায্য জাতিসংঘে সমালোচনার সম্মুখীন হবে। পাকিস্তান একে স্বাগতই জানাবে।

মনে হয় ভারত এই ভেবে বিচলিত যে, সীমান্তে তাদের এলাকায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি প্রতিরোধ–যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থনমূলক কাজকর্ম— অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, নিরাপদ আশ্রয় যোগানো— বাধাগ্রস্ত করতে পারে। যেহেতু ভারত ও পাকিস্তানে পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর ফলে তাই আমেরিকার কাছ থেকে ভারত আরো দূরে সরে গেছে। এশিয়া বিষয়ক অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি আঁকড়ে থেকে এবং বর্তমান সঙ্কটকে ভারত–পাক বিরোধ হিসেবে বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্র এক অবাস্তব ও অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করছে। তাঁরা মনে করেন যে, পাকিস্তান ও ভারতকে আকার, গুরুত্ব, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অথবা স্থিতিশীলতার নিরিখে— এক পাল্লায় তুলে বিচার করা যায় না। ওয়াশিংটনের জন্য বাস্তবোচিত নীতি হবে পাকিস্তানকে অলীক কল্পনাবিলাস ছেড়ে উপমহাদেশের রাজনীতিতে প্রধানের বদলে অপ্রধান ভূমিকা মেনে নিতে সাহায্য করা।

পূর্ব পাকিস্তানের মূল রাজনৈতিক সমস্যা থেকে আলাদাভাবে শরণার্থী ও মানবিক সমস্যাকে বিচার করার ওয়াশিংটনীয় প্রবণতাও একইরকমভাবে অবাস্তব। উপমহাদেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহালদের অধিকাংশের মতে, অন্যান্য মার্কিন পদক্ষেপের মতো পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রস্তাবও বাস্তব সঙ্কট এড়িয়ে সাময়িক স্থিতাবস্থা আনয়নের প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হয়, যার ফলে পাকিস্তানের অবশ্যম্ভাবী বিভক্তি কেবল বিলম্বিত হতে পারে মাত্র।

ডেটলাইন : পাটখালি
অক্টোবর ১০, ১৯৭১

গেরিলা এলাকায় জীবন ফিরে পাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানি শহর

অন্ধকার মাটির ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো বয়স্করা। কিন্তু শিশুরা, যুদ্ধের মোড় ফেরার কারণে যারা সহজে ফিরে পেয়েছে আগের প্রাণ, দলে দলে ছুটে এলো তাজ্জব বিদেশী অতিথিদের দেখতে, হাসিমুখে কলকলিয়ে উঠতে। কেউ কেউ সাগ্রহে হাতে তুলে নিল সবুজ-রঙা আইসক্রিম, যা নিয়ে এসেছিলেন সদানন্দ বাবুর স্থানীয় এক সংস্করণ, ইছামতি নদী ধরে এক মাইল দূরে ভারত সীমান্ত থেকে যিনি নৌকাযোগে এসেছিলেন। শিশুরা সবকিছু স্বাভাবিক করে তুলছে, কিন্তু পাটখালি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের একটি অস্বাভাবিক গ্রাম।

নিরাপদ অঞ্চলে চলে যাওয়া

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ধূলিসাৎ করার জন্য মার্চ মাসের শেষদিকে পাকবাহিনী আক্রমণাভিযান শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনী এই গ্রামে এসে সন্ত্রস্ত করে তুলে মানুষজনকে ধান ও পাটের আবাদ হ্রাস করতে বাধ্য করে। কেটে ফেলতে হুকুম করে কলা ও আমের গাছ, যেন বিদ্রোহী বাঙালি গেরিলারা আক্রমণ রচনার জন্যে কোনো আড়াল খুঁজে না পায়। বহু ঘরবাড়ি সৈন্যরা ভেঙে ফেলে, পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু গ্রামে তারা কাউকে হত্যা করে নি। তাহলেও এই সংযম কদিন বজায় থাকে সে-বিষয়ে গ্রামবাসীরা ভীত ছিল এবং তাঁদের বেশির ভাগই ইছামতি পার হয়ে ভারতে চলে যায়।

তিন মাস পর জুলাইয়ের শুরুর দিকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী নিজেদের পুনঃসংগঠিত করে এলাকায় ফিরে আসে। বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়ার কারণে হালকা হয়ে আসা পাকবাহিনীকে তাঁরা ক্রমাগত হয়রানি করে চলে এবং নিরাপদ এলাকায়

চলে যেতে বাধ্য করে।

গ্রামবাসীরা ফিরে আসতে শুরু করে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে সদলবলে এবং গ্রামের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০০–তে, প্রায় স্বাভাবিক সময়ের সমান। ফেরে নি কেবল হিন্দুরা, মুসলিম পাকবাহিনীর আক্রমণের যাঁরা বিশেষ লক্ষ্য। গ্রামের একটি হিন্দু পরিবারও ভারত থেকে ফিরে আসে নি, এবং তাঁরা ফিরবে বলেও গ্রামবাসীরা মনে করে না।

পাটখালি হচ্ছে কতিপয় 'মুক্ত এলাকার' একটি, ভারত সংলগ্ন এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভারতবেষ্টিত পূর্ব পাকিস্তানের এই ভূখণ্ড। বাংলাদেশ বাহিনীর কম্যান্ডার জানান যে, যশোর জেলাস্থ এই মুক্ত এলাকার আয়তন প্রায় ১০০ বর্গমাইল এবং খুলনা জেলার এমনি আরেক ভূখণ্ডের সঙ্গে এটা যুক্ত, যার আয়তন ২০০ বর্গমাইল। উভয় ভূখণ্ড মিলিয়ে এখানে প্রায় ১,৫০,০০০ লোকের বসবাস।

সঠিক হিসেব লভ্য না হলেও ওয়াকেবহাল মহলের অনুমান সবগুলো মুক্তাঞ্চল মিলিয়ে আয়তন দাঁড়াবে প্রায় ১০০০ বর্গমাইল। এটা যথেষ্ট বড় সংখ্যা মনে হতে পারে যদি না আমরা খেয়াল রাখি যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আয়তন হচ্ছে ৫৫,০০০ বর্গমাইল। গেরিলারা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে প্রসারিত করে চলেছে ঠিকই কিন্তু 'মুক্তাঞ্চল' অভিধাটি খুব বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। এর কিছু অংশ জলাভূমি, কিছুটা জঙ্গল যা আর্মি সবসময়েই অগম্য ও প্রতিরোধের প্রয়োজনহীন বিবেচনা করেছে। কতক ক্ষেত্রে মুক্ত এলাকার অভ্যন্তরে শক্ত ঘাঁটিতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এখনও অবস্থান করছে।

ফিতের মতো লম্বা পাটখালি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে সিকড়ি গ্রামে পাকবাহিনীর একটি দল রয়েছে। এই আর্মি বাংকারে গেরিলারা অনবরত নজরদারি ও হামলা চালিয়ে আসছে। বিদেশী অভ্যাগতদের আসার আগে গতরাতেও এমনি এক হামলা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘাঁটি ছাড়ছে না। উত্তরমুখী রেললাইন ধরে বড় এক সেনাদল মাঝে মাঝে তাদের জন্য রসদ নিয়ে আসে।

গেরিলাদের আওতাধীনে পাটখালির গ্রামবাসী মোটামুটি নিরাপদ বোধ করছে। 'মুক্তিবাহিনী এখানে এসেছে, তাই আমরাও এসেছি,' আইজুদ্দিন মণ্ডল নামের একজন কৃষক বললেন, 'আমরা এখন নিরাপদ।'

জবরদস্তিভাবে ফসল নষ্ট করে দেওয়ার ফলে এখন এক কঠিন সময় চলছে। দুর্গতি আরো বেড়েছে সাম্প্রতিক বন্যার কারণে। কিন্তু এঁরা হচ্ছে দৃঢ়, বেঁচে থাকার প্রত্যয়দৃপ্ত মানুষ যাঁরা প্রায় প্রতি বৎসর লড়াই করছে মানব–সৃষ্ট না হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে। এবং আবারও তাঁরা নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে। ফসলের কিছুটা পাক আর্মির নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কিছু পরিমাণ পাট, চাষীর ঘরের উঠোনের বেড়ায় এখন উঁচুমানের রুপোলি এই পাট শুকোতে দেওয়া হয়েছে রৌদ্রের কড়া তাপে। শুকনো ও গাঁট বাঁধা আরো কিছু পাট নৌকোয় তোলা হচ্ছে, ভারতে নিয়ে বিক্রির জন্য। বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, পাকিস্তানি ও ভারতীয় টাকা, তা দিয়ে কেনা হবে খাবার ও অন্যান্য দুর্লভ পণ্য, যেমন লবণ, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, জামাকাপড় ইত্যাদি।

লণ্ডভণ্ড পাটখেতে চাষীরা ধান লাগিয়েছে, বেশ বড় হয়ে উঠেছে চারাগুলো। অর্থকরী

ফসলের চেয়ে পেটের খিদে মেটানোর চাহিদা বড়।

ধূলিসাৎ ডিসপেনসারি

মাটির ঘরগুলোর কিছু কিছু ঠিকঠাক করা হয়েছে। হিন্দু পরিবারের ফেলে যাওয়া অন্য ঘরগুলোর ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে। গ্রামের একমাত্র ডিসপেনসারি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছে ক্লাবঘর। প্রাইমারি বিদ্যালয়ের একতলা টানা ঘরটি অক্ষত রয়েছে কিন্তু বেঞ্চ-টেবিল সব পুড়িয়ে দিয়েছে পাক আর্মি। স্কুল এখন বন্ধ। ঘরের সামনে সাঁটানো রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের বন্দী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি। স্কুল যে চলছে না গ্রামের ক্ষয়ক্ষতির সেটা সবচেয়ে হাল্‌কা দিক। মনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে বৃদ্ধরা।

ধবধবে সফেদ দাড়ির কুঞ্চিত চর্মসার এক বৃদ্ধ তাঁর ভাঙা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুময় চোখে বললেন, 'দেখো ওরা আমাদের কি দশা করেছে। সবকিছু ওরা ধ্বংস করেছে—গাছগাছালি পর্যন্ত। আমাদের দয়া করে সাহায্য করো।'

এক অন্ধ রমণী অন্য বাড়ি থেকে আনা ধান ভানছিলেন ঢেঁকিতে। কাজটি খুব কষ্টসাধ্য। 'এছাড়া আর কিই-বা করার আছে,' তিনি বললেন। 'পেটের খিদে মেটাতে যে দু'চার পয়সা আসে তাই সই।'

গেরিলারা এই এলাকার নিয়ন্ত্রণে রইলেও সরকার বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার ধারেকাছে কিছু নেই। উপ-প্রধান গেরিলা অফিসার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিন চৌধুরী, বিমানবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, অভ্যাগতদের পাসপোর্টে ছয় ঘণ্টার ভিসা মঞ্জুরের ছাপ দেয়ার বিস্তারিত আয়োজন রাখলেও, বোঝা যায়, এটা মূলত পত্রিকার আলোকচিত্রীদের মুখ চেয়ে করা হয়েছে।

কর আদায় বন্ধ

অর্থনৈতিক কারণে বেসামরিক প্রশাসনের কর আদায় কাজ হচ্ছে না এবং আইনগত বিবাদ মোকাবেলা করা হচ্ছে প্রশান্ত দৃষ্টিতে। লেফটেন্যান্ট চৌধুরী বললেন, 'প্রশাসনিক কাজ বলতে বোঝায় কেবল আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ রাখা। যদি জমির বিবাদ নিয়ে দুই পক্ষ এসে হাজির হয় আমাদের কাছে আমরা উভয়ের বক্তব্য শুনে সালিশির চেষ্টা করি। সহজ সরল বিচার-ব্যবস্থা আর কি!'

স্থানীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ১৫৮ সদস্যের কম্পানি কম্যান্ডার হচ্ছেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আখতার-উজ-জামান, ২৫ বছরের এই কলেজ স্নাতক অতি সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের কাকুল মিলিটারি একাডেমি থেকে পাশ করে বের হয়েছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন কমিশন-প্রাপ্তির জন্য, তখনই যুদ্ধ শুরু হয়।

তাঁর সৈন্যদল এবং তাঁদের সিঙ্গল-শট বন্দুকপাতি একটি দীন চেহারাই ফুটিয়ে তুলছে, তবে তাঁদের মনোবল খুব দৃঢ়। অথচ অধিকাংশ সৈনিকই অপেশাদার ও অন্যান্য জেলা

থেকে আগত এবং তাঁদের পরিবার এখন কোন্ অবস্থায় আছে তাঁরা তার কিছুই জানে না।

স্পষ্টভাষী ও দৃঢ়চেতা তরুণ এই লেফটেন্যান্ট তাঁর লোকদের আত্মদানকারী মনোভাবের কথা বারবারই বলছিলেন, 'আমাদের শৃঙ্খলা ও মনোবলের কোনো সমস্যা নেই। জীবন উৎসর্গ করতেই এ-যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সবাই। সকলেই মানসিকভাবে সচেতন।'

সামনে দীর্ঘ সংগ্রাম

যুদ্ধ আর কতকাল চলবে এটা জানতে চাইলে তিনি কোনো দ্বিধা না করে জবাব দিলেন, 'এটা দু-বৎসর সময় নিতে পারে।' তাঁর পাশের কয়েকজন বাঙালি রাজনৈতিক কর্মী গুঞ্জন করে উঠে এই মতের বিরোধিতা করলেন। তাঁদের বক্তব্য হলো বিজয় খুবই নিকটে, কিন্তু লেফটেন্যান্ট নিজের মতে অনড় রইলেন।

কেবল একটি বিষয়েই লেফটেন্যান্ট অস্পষ্ট রইলেন, তা হলো হতাহতের সংখ্যা। তিনি বললেন, তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সামান্যই, পক্ষান্তরে পাকিস্তানের প্রচুর হতাহত হয়েছে। লেফটেন্যান্ট আখতার-উজ-জামান মোটামুটি ভালোই ইংরেজি বলেন এবং তাঁর ইংরেজি কিছুটা মার্কিনি কেতারও বটে। আমেরিকান স্ল্যাং বা গালমন্দ শুনে হেসে উঠলেন তিনি। অভ্যাগতদের একজনকে জানালেন তাঁর গায়ের টি-শার্টের মতো অবিকল একটি জামা তাঁরও রয়েছে। ১৯৬৪ সালে যশোরে তিনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন সেখানে আগত আমেরিকান শান্তি বাহিনীর (পিস কর্পস্) দুই সদস্যের একজন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের নামও বললেন—ফরেস্ট নল, ক্যালিফোর্নিয়ার উইলিয়াম রাসেল এবং বোস্টনের ডোনাল্ড ভিলেনকোর্ট। অভ্যাগতরা যখন বিদায় নিচ্ছিল বেশ গর্বের সঙ্গে তিনি বললেন, 'অনুগ্রহ করে ওঁদেরকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দেবেন এবং বলবেন আমি লড়াই করছি বাংলাদেশের ভেতরে থেকে।'

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
অক্টোবর ১১, ১৯৭১

বাঙালিদের জন্যে অস্ত্রের চালান আসছে কলকাতায়

কড়া নিরাপত্তা প্রহরায় সামরিক সরঞ্জাম বহনকারী বেশ কটি বিশেষ ট্রেন এখন প্রতিদিন এখানে এসে পৌঁছুচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, এইসব অস্ত্র আসছে বাঙালি গেরিলাদের জন্য, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে এবং প্রতীয়মান হচ্ছে পাক আর্মির বিরুদ্ধে তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য তাঁরা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গেরিলাদের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে ভারত কতদূর পর্যন্ত এগোবে। এযাবৎ ভারতীয়রা নিরাপদ আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও কিছু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে চলেছে। ছয় মাস বয়েসী স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কলকাতায় যাঁদের ঘাঁটি, অভিযোগ করছেন যে, প্রশিক্ষণ–প্রাপ্ত সবাইকে হাতিয়ার যোগানোর মতো যথেষ্ট অস্ত্র ভারত তাঁদের দিচ্ছে না। অধিকন্তু ভারত, মূলত তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শে, বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় নি। এই সংযত থাকার পেছনে মূল ভাবনা যেটা কাজ করেছে তা হলো স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে।

কঠোর প্রহরায় মালবাহী ট্রেনের কলকাতা আগমন–প্রবাহ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভারত গেরিলাদের আরো অস্ত্র যোগাতে সম্মত হয়েছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে ভারত দিতে প্রস্তুত হয়েছে গেরিলারা আসলে যা চাচ্ছে—সম্মুখ–যুদ্ধ করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি দখলের চেষ্টায় ভারতের গোলা, অস্ত্র ও বিমান সমর্থন। ভারতীয় সৈন্যরা এমনি অভিযানে সংশ্লিষ্ট না হলেও পাকিস্তানিরা একে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলেই বিবেচনা করবে।

বিভক্ত পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তেই ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্যে সন্দেহের মাত্রা বেড়ে চলেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদে জানা যায় বরাবরকার উত্তেজনাপ্রবণ সীমান্ত এলাকায় উভয় পক্ষই শক্তি জোরদার করছে। বর্তমান সংবাদদাতা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সৈন্য চলাচল দেখতে পেয়েছে। পেট্রাপোলের একটি সীমান্ত কেন্দ্রে ভারতীয় সৈন্যরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে।

আরেকটি ভারত-পাক যুদ্ধের সম্ভাব্যতা নিয়ে নানা গুজব রয়েছে। তবে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে তা অত্যাসন্ন। সৈন্য চলাচলের ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অংশও হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ভারতের সংবাদ-মাধ্যম জুড়ে রয়েছে পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি, কতক সীমান্ত থেকে বেসামরিক নাগরিকদের স্থানান্তর এবং যুদ্ধোন্মাদনা ও ভারত-বিদ্বেষী প্রচারণা সংক্রান্ত রিপোর্ট। একইরকমভাবে পাকিস্তানি পত্র-পত্রিকা ভরে আছে ভারতের যুদ্ধসাজ ও সীমান্তে গোলাবর্ষণের মতো উস্কানিমূলক তৎপরতার সংবাদ। উপরন্তু বাঙালি শরণার্থীদের শিবিরগুলোর চারপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছে পাকিস্তানি এজেন্টরা এইসব শিবিরে অনুপ্রবেশ করেছে। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত রাজ্য আসামের তেল শোধনাগার ও ভাণ্ডার এলাকায় নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিমান হামলা প্রতিরোধক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত টুকরো টুকরো সংবাদ মিলে কোনো পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে না উঠলেও এটা বেশ বোঝা যায় মৌসুমি বৃষ্টি ও বন্যা সবে সমাপ্ত হওয়ার পর পাক আর্মি ও বাঙালি গেরিলা উভয় পক্ষই তাদের তৎপরতা জোরদার করতে যাচ্ছে।

আর ভারতের দিকে শরণার্থী সমস্যাজনিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ বেড়েই চলেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মতে ৯ মিলিয়নের বেশি শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং অব্যাহতভাবে প্রতিদিন আসছে প্রায় ৩০,০০০ উদ্বাস্তু। পাকিস্তানিদের হিসেবে অবশ্য এই সংখ্যা অনেক কম। বিদেশী কূটনীতিকদের প্রশ্ন হলো এর শেষ কোথায়, কোন্ পর্যায়ে গিয়ে ভারত সিদ্ধান্ত নেবে যে এর চাপ এতো বেশি যে শরণার্থী আগমন ঠেকাতে তাকে প্রত্যক্ষ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ-দুই দেশের সরকার যাই করুক না কেন, এখানে প্রাপ্ত খবরে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে গেরিলারা শিগ্‌গিরই তাঁদের আক্রমণ জোরদার করতে চলেছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা কতক শক্ত আঘাত হেনেছে। প্রধান রেল যোগাযোগ ও মূল মূল সড়ক তাঁরা বিচ্ছিন্ন করেছে এবং এখনও চালু হতে দিচ্ছে না। উড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য সেতু এবং লাগাতার আঘাত করে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রগুলোতে। আগস্টের পর থেকে গেরিলা ফ্রগম্যানরা পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরে নোঙর-করা জাহাজ আক্রমণ করতে শুরু করেছে। এর ফলে বৃটিশ জাহাজগুলো পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরে মাল খালাস করা বন্ধ করে দিয়েছে।

গেরিলারা বড় রকম সাফল্য দাবি করছে

গেরিলারা দাবি করছে তাঁরা এ-যাবৎ ২০ থেকে ৩০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা করেছে। এই দাবি অতিরঞ্জিত মনে হলেও পাকিস্তানিদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বলেই মনে হয়। গেরিলাদের হতাহতের কোনো হিসেব পাওয়া যায় নি।

পূর্ব পাকিস্তানে আনুমানিক প্রায় ৮০,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য রয়েছে। এছাড়া আছে আরো ১০,০০০ দ্রুত প্রশিক্ষণ দেওয়া অবাঙালি আধা-সামরিক বাহিনী। গেরিলাদের সংখ্যা হবে ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০-এর মধ্যে। মার্চ মাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরুর পর এঁদের বেশির ভাগ প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পেশাদার সৈনিকদের ভরকেন্দ্রটি গঠিত হয়েছে ১৫,০০০ সদস্য সমবায়ে, যাঁরা আধা-সামরিক সীমান্তরক্ষী দল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স এবং নিয়মিত সেনা ইউনিট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ঘাঁটি এলাকাগুলোর বেশির ভাগই সীমান্তের ভারতীয় দিকে অবস্থিত। তবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বাঙালিরা সীমান্ত সংলগ্ন পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ড থেকে তৎপরতা পরিচালনা করছে।

নতুন রিক্রুটদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে গেরিলা ও নিয়মিত সৈনিক হিসেবে। একজন পদস্থ কর্মকর্তা আমাকে জানালেন, 'আমাদের উভয় ধরনের যোদ্ধাই দরকার। কেননা গেরিলারা পারে কেবল আঘাত করে শত্রুকে দুর্বল ও নরম করে ফেলতে। আমাদের এমন এক বাহিনী প্রয়োজন যারা ভূখণ্ড অধিকার করে রাখতে পারে।'

ডেটলাইন : নয়াদিল্লি, ভারত
অক্টোবর ১৭, ১৯৭১

বাংলাদেশের জন্য দাঁতে দাঁত চাপা যুদ্ধ

য়েতকংরা যদি প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরুর ছয়মাসের মধ্যে এইরকম অবস্থায় পৌছুতে পারতো তবে একে চমকপ্রদ সাফল্য হিসেবে গণ্য করতো।' বিদেশী কূটনীতিক এমনি মন্তব্য করলেন মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে, বাংলাদেশ নামকরণকৃত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুদ্ধরত বিদ্রোহীরা 'মুক্তিবাহিনী' হিসেবেই পরিচিত।

মার্চের শেষাশেষি বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন দমন করতে পাকবাহিনীর আক্রমণের জবাবে অসংগঠিত হতবুদ্ধি যোদ্ধা দল থেকে মুক্তিবাহিনী তেল চকচকে যুদ্ধ–মেশিনে না হলেও এখন পরিণত হয়েছে, অন্তত মোটামুটিভাবে সংহত ও বিশেষ কার্যকর গেরিলা শক্তিতে।

অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ আশ্রয় যুগিয়েছে ভারত এবং স্পষ্টতই ভারতীয় সহায়তা ছাড়া বিদ্রোহী তৎপরতা বর্তমান স্তরে পৌছুতে পারতো না। কিন্তু বিদ্রোহী মানুষ ও বিদ্রোহের তাগিদ এসেছে পূর্ব পাকিস্তানিদের ভেতর থেকে, তাদেরকে যদি সম্পূর্ণভাবে নিজের ওপর নির্ভর করতে হতো তাহলেও পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি প্রতিরোধ পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারতো কি না সন্দেহ।

আনুমানিক ৮০,০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে কয়েক হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ। রাজাকার হিসেবে পরিচিত প্রায় ১০,০০০ বাঙালিকে দ্রুত প্রশিক্ষণ দিয়ে হোমগার্ড হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

এই বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা হবে আনুমানিক ৮০,০০০ থেকে ১০০,০০০। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, কম সংখ্যাটিই বেশি যথার্থ। এদের

মধ্যে পেশাদার সৈনিকের সংখ্যা ১৫,০০০-এর বেশি হবে না, এদের অনেকেরই আবার উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেই। এঁরা হচ্ছেন সীমান্ত-প্রহরী আধা-সামরিক বাহিনী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স এবং উন্নততর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত সেনা ইউনিট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে দলত্যাগী সদস্য। এর বাইরে রয়েছে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ নতুন রিক্রুট। বেশিরভাগই কলেজের ছাত্র, বয়স ১৮ থেকে ২৫, তবে এর মধ্যে অনেকেই গ্রামের ছেলে। এদের সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

অনেক বাংলাদেশী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও ঘাঁটি এলাকা সীমান্তের ভারতীয় দিকে অবস্থিত। তবে বর্ধমান সংখ্যায় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের ঠিক ভেতরে 'মুক্ত এলাকা' থেকে অপারেশন পরিচালনা করছে। এইসব এলাকা খুব বড় না হলেও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।

নতুন রিক্রুটদের কাউকে কাউকে নিয়মিত সৈনিকের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, অন্যদের গেরিলা প্রশিক্ষণ। গেরিলারা গ্রামের লোক সেজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে থাকে। মূলত অস্ত্রের অভাবের দরুন মুক্তিবাহিনীর সদস্যভুক্তির একটা সীমা রয়েছে এবং এর বাইরে রয়েছে অজস্র স্বেচ্ছাসেবক। বিপুলসংখ্যক ছেলে যৎসামান্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ-লাভের পর এখন সময়ক্ষেপণ করে চলেছে, এদের ট্রেনিং বলতে শারীরিক ব্যায়াম ও গাড়ি চালানো শেখা এটুকুকেই বোঝায়।

মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র হচ্ছে নানা কিছুর মিশেল। স্টেনগান, হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রয়েছে, রয়েছে বেশকিছু পুরনো সিঙ্গল-শট রাইফেল। সবচেয়ে ভারি অস্ত্র হচ্ছে হালকা ও মাঝারি ধরনের মর্টার, তবে এর সংখ্যা বেশি নয়। এইসব অস্ত্র বিভিন্ন নির্মাতা ও বিভিন্ন সময়ের। কতক অস্ত্র পাকিস্তানিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, আর কতক—বাঙালিদের অভিযোগ, মোটেই যথেষ্ট পরিমাণে নয়—দিয়েছে ভারত।

এতসব সমস্যা সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান আর্মিকে কার্যকরভাবে উত্যক্ত করে চলছে, কোনো কোনো অঞ্চলে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে আটকে রাখছে এবং গোটা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ছড়িয়ে থাকতে বাধ্য করছে। বিশ্বস্ত সূত্রে ইঙ্গিত মেলে যে, পাকিস্তানিদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। অধিকৃত এলাকায় প্রশাসন চালানো এবং অন্যান্য কর্মে অবাঙালি ও অপরাপর দালালদের নিয়ে গঠিত পাকবাহিনীর সহযোগী স্থানীয় 'শান্তি কমিটি'র সদস্যদের হত্যা করা গেরিলারা অব্যাহত রেখেছে। গেরিলাদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা পাওয়া যায় নি, তবে এই সংখ্যা কম বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু প্রতিটি গেরিলা হামলার পর পাকবাহিনী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বসতি জ্বালিয়ে দেয়, গ্রামবাসীদের হত্যা করে।

গেরিলাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে রাস্তা, রেললাইন, সেতু উড়িয়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে সেনাবাহিনীর সচলতা ক্ষুণ্ন করা। গেরিলা নৌকম্যান্ডোরা ইতিমধ্যে অন্তত এক ডজন সমুদ্রগামী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা নিমজ্জিত করেছে। এর মধ্যে বন্দরে নোঙর-করা কয়েকটি বিদেশী জাহাজও রয়েছে। সাতটি বৃটিশ শিপিং লাইন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জাহাজ যোগাযোগ স্থগিত করেছে।

ছয় মাস আগে যে অবস্থায় ছিল মুক্তিবাহিনী এখন তার চেয়ে অনেক সুসংগঠিত হলেও

এটা এককাট্টা লড়িয়ে শক্তি নয়। পিকিংপন্থী কমিউনিস্টসহ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গ্রুপ তাদের নিজস্ব অপারেশন শুরু করেছে। ঢাকার এক অকমিউনিস্ট জঙ্গি ছাত্রনেতার পরিচালনাধীন ১৫০০ সদস্যের একটি গোষ্ঠী ভারতীয় সীমান্তরাজ্য ত্রিপুরায় তাঁদের ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তবে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ আন্দোলন কিংবা বামঘেঁষা আন্দোলনের মধ্যে কোনো গুরুতর বিভক্তির লক্ষণ দেখা যায় নি।

বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাতের শেষে এখন মনে করা হচ্ছে যে, মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনী উভয়েই পূর্ব পাকিস্তানে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করবে। কড়া প্রহরায় সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে মালবাহী ট্রেন কলকাতা এসে পৌঁছেছে। জানা যায়, এসব হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর জন্য সামরিক সরবরাহ। এর থেকে ইঙ্গিত মেলে যে গেরিলাদের জন্য সামরিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে ভারত সরকার সম্মত হয়েছে।

তবে মুক্তিবাহিনীর কম্যান্ডাররা চাচ্ছেন আরো বেশি কিছু—পূর্ব পাকিস্তানের ভূমির কিয়দংশ দখলের জন্য সম্মুখ-যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁরা ভারতীয় লজিস্টিক ও এয়ার কভার পেতে চান। বর্তমানে কলকাতাস্থিত বাংলাদেশ সরকারকে তাহলে এখানে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এখন পর্যন্ত ভারতীয়রা এই প্রস্তাবে অরাজি রয়েছে, কেননা, তারা মনে করেন, এর ফলে তৎক্ষণাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। বাংলাদেশের নেতারা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, গেরিলা যুদ্ধের সকল কার্যকারিতা সত্ত্বেও আঘাত করো ও পালাও নীতির বদলা হিসেবে পাকিস্তানিরা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর যে আক্রমণ চালাচ্ছে তার পরিণামে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থনে ভাটা দেখা দিতে পারে।

একজন পদস্থ বাঙালি অফিসার জানালেন, 'অনেক গ্রামবাসীর সমর্থন আমরা হারাবো। তারা আমাদের বলে, আমাদের সমর্থন পেতে হলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে আসুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন, সবাইকে রক্ষা করুন।'

ডেটলাইন : নয়াদিল্লি, ভারত
অক্টোবর ১৯, ১৯৭১

সীমান্ত জুড়ে মুখোমুখি ভারতীয় ও পাকিস্তানি সৈন্য

ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এখন সীমান্ত জুড়ে মুখোমুখি অবস্থানে। এখানকার অনেক পশ্চিমী কূটনীতিক এমন ভাবনার পক্ষপাতী যে, অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে প্রথম সৈন্য মোতায়েন করেছে পাকিস্তানিরা এবং ভারত পরবর্তী পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভারতীয় পদস্থ মহল থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে গত মাস থেকে সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং গত বৃহস্পতিবারের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পদাতিক ও সাঁজোয়া বহর সীমান্তে অথবা সীমান্তে আঘাত-হানা-সক্ষম দূরত্বের মধ্যে মোতায়েন হয়ে গেছে।

সূত্র জানায়, প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সীমান্ত এলাকার কোনো কোনো খাল প্লাবিত করে দেয়া হয়েছে এবং কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চল থেকে বেসামরিক পাকিস্তানি নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদের কেউ কেউ সেনাবাহিনীর নির্দেশে সরে গেছে, অন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেছে।

সবচেয়ে বেশি সৈন্য সমাবেশ ঘটেছে সেইসব স্থানে, যেখান দিয়ে ১৯৬৫ সালের তিন সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা ভারতে প্রবেশ করেছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে, যেখানে চার বা পাঁচ ডিভিশন সৈন্য রয়েছে বলে ধারণা করা হয়, সেখানকার সীমান্তেও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভারতীয়রাও সীমান্তে চার-পাঁচ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে বলে জানা যায়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান অভিযোগ করেছেন যে, সীমান্তে ভারত আট ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে।

অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতাকামী বাঙালি গেরিলা যোদ্ধাদের ক্রমবর্ধমান হামলার

মোকাবেলা করতে হচ্ছে পাকবাহিনীকে। এই গেরিলারা ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ আশ্রয় পাচ্ছে।

এক হিসেবে জানা যায়, মার্চ মাসে বিচ্ছিন্নতাবাদী বাঙালি আন্দোলন দমাবার জন্য পাকবাহিনীর অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে নয় মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানি ভারতে চলে এসেছে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে ভারতের ১২ থেকে ১৩ ডিভিশন সৈন্য রয়েছে বলে মনে করা হয়।

এখানে নয়াদিল্লিতে কোনো যুদ্ধ উন্মাদনা অথবা শঙ্কা নেই। শুধু কিছু কিছু পরিবার চলে এসেছে সীমান্ত–শহর থেকে, যেখানে নিষ্প্রদীপ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা মহড়া শুরু হয়েছে।

ভারতীয় মহল সীমান্তের সৈন্যসংখ্যা না জানিয়ে শুধু বলেছে, 'সেখানে আমরা তাদের চেয়ে শক্তিশালী।' এই উৎস আরো জানায়, 'সীমান্তে ভারতীয় মোতায়েন প্রায়–সম্পন্ন অথবা সম্পন্ন হয়েছে।' গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এক অফিসার বললেন, 'আমরা এখন তৈরি অবস্থায় রয়েছি।'

আরেক ভারতীয় উৎস জানালেন, ১৪ অক্টোবর রাত 'আমাদের খুব ভয়ে কেটেছে', সেদিন খবর পাওয়া গিয়েছিল যে আজ রাতে পাকিস্তান পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ শুরু করতে পারে। 'জেনারেল স্টাফ সারারাত জেগে কাটান। খবরটি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার হতে পারে অথবা এমন হতে পারে শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান তাদের পরিকল্পনা বদল করেছে।'

ভারতীয় উৎস ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় গোলাবর্ষণ, মাইন–পোঁতা ইত্যাদি পাকিস্তানি 'হুমকি'র বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা সরকার ভাবছে। এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছি, পক্ষান্তরে দৃঢ় পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের ওপরও জোরদার চাপ রয়েছে।'

পাল্টা ব্যবস্থা বলতে পাকিস্তানি সৈন্যদের ধাওয়া করে সীমান্তের অপর পারে চলে যাওয়া এবং এর ফলে পুরো মাত্রায় সংঘর্ষ শুরু বোঝাবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তেমন ঘটলে পরিণতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

আজ সকালে জনাকীর্ণ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি সংযত থাকার জন্য তাঁর আহ্বান সম্পর্কে জিগ্যেস করা হয়।

তিনি বলেন, 'পাকিস্তান তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে এটা বেশ সুন্দর ও মিষ্টি বচন। কিন্তু সীমান্ত জুড়ে সৈন্য সমাবেশ, ভারত–বিদ্বেষী প্রচারণা, পবিত্র যুদ্ধ–জেহাদের ডাক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানই পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। এটা একতরফা ব্যাপার নয়। মুঠো পাকানো হাতের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব নয়।'

তিনি বলেন, 'আপনারা তো জানেনই, সবাই আমাদের সংযমের প্রশংসা করছেন। আমরা পাই মৌখিক সহানুভূতি, আর যারা সংযম দেখায় নি, তারা পায় অস্ত্র সাহায্য।' পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রের কতক ধরনের সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রতি এটা একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত।

ডেটলাইন : নয়াদিল্লি, ভারত
অক্টোবর ২৩, ১৯৭১

ভারত-পাকিস্তান : তারা যুদ্ধের কথা বলছে, তারা যুদ্ধ বাধিয়ে দিতেও পারে

‘তারা কি এটা ঘটাবে অথবা ঘটাবে না ?’ ভারত-পাকিস্তান আবারও যুদ্ধ ঘটাতে যাচ্ছে কিনা সেটা বিবেচনাকালে এখানকার বিদেশী কূটনীতিকদের আলোড়িত করছে এই প্রশ্ন। প্রতিদিনই বাজির রকমফের হচ্ছে। চলতি সপ্তাহান্তে এর সম্ভাবনা ছিল ৫০ : ৫০।

সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করতে খুব বেশি কিছুর আর দরকার নেই। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় দুই দেশের সৈন্যরা যার যার অবস্থান নিয়ে বসেছে। অন্তত পশ্চিম প্রান্তে এটা পরিষ্কার দেখা গেছে যে পাকিস্তানই প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল। ভারত তার রিজার্ভ বাহিনীকে তলব করেছে।

সাত মাসব্যাপী সীমান্ত-অঞ্চলীয় টেনশনের জের হিসেবে এই সৈন্য সমাবেশ ঘটেছে। এর সূচনা গত মার্চে, যখন পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ঝাঁপ দেয়। পরবর্তী সামরিক নিপীড়নের কারণে দলে দলে পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করে (বর্তমান হিসেবে এই সংখ্যা প্রায় ৯.৫ মিলিয়ন)। এর ফলে ভারতের আর্থিক ও সামাজিক বাতাবরণের ওপর বিরাট চাপ পড়ে। ইতিমধ্যে ভারত বাঙালি বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ও নিরাপদ আশ্রয় যোগাতে শুরু করেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যাদের গেরিলা যুদ্ধ ক্রমেই কার্যকর হয়ে উঠছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, গেরিলারা পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা নিলে তিনি এটাকে ভারতের আক্রমণ হিসেবে গণ্য করবেন এবং এর মোকাবেলায় যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

প্রত্যুত্তরে ভারতীয়রা জানিয়েছে যে, তারা কোনো যুদ্ধের সূচনা ঘটাবে না। তবে পাকিস্তান চাইলে যে-কোনো যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তুত রয়েছে।

ইদানীংকালে সীমান্ত সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাগাড়ম্বরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১২ অক্টোবর জাতীয়ভাবে প্রচারিত এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রভূত পরিমাণে জেহাদি বুলি আউড়ে হিন্দু ভারতকে 'উত্তুঙ্গ সামরিক প্রস্তুতির' জন্য অভিযুক্ত করেন এবং সতর্ক করে বলেন, '১২০ মিলিয়ন ইসলামি মুজাহিদ নিয়ে গঠিত এই জাতি পাকিস্তানের পবিত্র জমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।'

ভারতের দিক থেকে গেল সপ্তাহে জবাব দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, যাঁকে বলা যায় ইন্দিরা গান্ধী সরকারের কটুভাষী স্পিরো এগনিউ। ঐতিহাসিকভাবে সামরিক মনোভাবাপন্ন পাঞ্জাবে এক বক্তৃতায় তিনি শপথ নিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে যুদ্ধ হবে পাকিস্তানের মাটিতে এবং তার সৈন্যরা যে এলাকা দখল করবে ভারত সেটা ছেড়ে দেবে না। দুই দিন পরে এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রীমতী গান্ধী কিছুটা নম্র ভাষায় জগজীবন রামের কথাটা পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁকে যখন জিগ্যেসা করা হলো শান্তি আলোচনা ও পারস্পরিক সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা সম্পর্কে, সরকারি পাকিস্তানি বার্তা সংস্থা যা প্রচার করেছে, তিনি চট্জলদি জবাব দিলেন, 'মুঠো করা হাতের সঙ্গে তো আপনি করমর্দন করতে পারেন না।'

নয়াদিল্লিতে অনেক ধরনের বিমর্ষ আলোচনা চালু আছে। গড়পড়তা ভারতীয়রা মনে করেন যুদ্ধ লেগে যাওয়া খুবই সম্ভব, তবে কোনোরকম যুদ্ধ-উন্মাদনা ছাড়া আটপৌরেভাবে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ করেন। গড়পড়তা বিদেশী কূটনীতিকরা এখনই কোনো দেশ যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন ভারতের ওপর সোভিয়েত প্রভাব এবং পাকিস্তানের ওপর মার্কিন প্রভাব পক্ষদ্বয়কে সংযত করতে সাহায্য করবে। গত শুক্রবার রুশিরা তাদের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিনকে ঝটিতি নয়াদিল্লি পাঠিয়েছিল। কিন্তু দুই দেশের সৈন্যবাহিনী যখন পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে, কোথাও কোথাও মাত্র কয়েক শত গজ ফারাকে, তখন যুদ্ধের ঝুঁকি অত্যন্ত বাস্তব এবং কোনো বিদেশী পর্যবেক্ষকই নির্দ্বিধায় শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী করছেন না।

কলরবমুখর কূটনীতিক মহলে যত কূটনীতিক রয়েছেন, তত্ত্বও রয়েছে ততো। এক তত্ত্ব অনুযায়ী ভারত সিদ্ধান্ত নেবে যে উদ্বাস্তুর বোঝা অসহনীয় হয়ে উঠেছে ও পূর্বাংশে পাকিস্তানি শাসন অবসানের জন্য চাপ প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীন দেশে শরণার্থীদের প্রত্যাগমন সম্ভব করে তুলবে। অপর তত্ত্ব অনুসারে বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব ভূখণ্ডে সামরিক দখল বহাল রাখা অসম্ভব বুঝতে পেরে মরিয়া-হয়ে-ওঠা পাকিস্তান আক্রমণ করবে ভারতকে—এই ভরসায় যে তৎক্ষণাৎ ভারত-পাক শান্তির জন্যে বিশ্বজনীন চাপ সৃষ্টি হবে এবং ফল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।

কতক মহলে 'বানজাই' নামে পরিচিত আরো একটি তত্ত্ব রয়েছে যার অনুসরণে বাঙালি গেরিলাদের হাতে তাদের অসম্মানজনক পরাজয় আসন্ন উপলব্ধি করতে পেরে অহঙ্কারী পাক জেনারেলরা বেছে নেবে শক্তিমান সামরিক শত্রু ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে হার মানার

সুযোগ।

এছাড়া রয়েছে আরো এক তত্ত্ব, যে তত্ত্বের বক্তব্য হলো পাকিস্তানি সৈন্য মোতায়েনের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে সযত্নে প্রণীত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অংশ, যার লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বসমাজ, বিশেষভাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে ভীতসন্ত্রস্ত করে হস্তক্ষেপে বাধ্য করা। এমনি চিন্তাধারা অনুযায়ী পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা সমস্যাটিকে ভারত–পাক বিরোধে রূপ দেয়া এবং এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট সামরিক সন্ত্রাস থেকে বিশ্বের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি আরেকটি লক্ষ্য হতে পারে বিশ্বজনীন চাপের দ্বারা ভারতকে বাঙালি বিদ্রোহীদের সামরিক সহায়তা–দান থেকে বিরত রাখা।

এই সমস্ত বহুমুখী তত্ত্বের প্রাচুর্য সত্ত্বেও একটি বিষয়ে কূটনীতিকরা সবাই মনে হয় একমত—সৈন্যবলে অস্ত্রবলে পাকিস্তানিদের ছাপিয়ে গেছে ভারতীয়রা এবং পাকিস্তানি আক্রমণ তাই আত্মঘাতী হবে।

এক কূটনীতিক বললেন, ‘পরিস্থিতি এখনও নাজুক। একে অপরের পরিমাপ নিচ্ছে। সীমান্ত সংঘর্ষ এমনিভাবে অব্যাহত থাকতে পারে মাসের পর মাস, নিয়মিত বিরতি দিয়ে মাঝেমধ্যে বেজে উঠবে বিপদসঙ্কেত।’

ডেটলাইন : নয়াদিল্লি, ভারত
নভেম্বর ২, ১৯৭১

কঠোর নীতি নিচ্ছে ভারত

ব্যাপক কূটনীতিক ও সামরিক চাপের মুখে প্রতীয়মান হচ্ছে ভারত পাকিস্তান এবং পশ্চিমী দেশসমূহ বিশেষভাবে আমেরিকার প্রতি তাঁর নীতি কঠোর করে তুলছে। ভারতের বিবেচনায় পশ্চিমী দেশসমূহ, সমস্যা অনুধাবনে ঘাটতির পরিচয় দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমা দেশে তাঁর তিন সপ্তাহের সফর কর্মসূচি বহাল রেখেছেন। আগামীকাল তিনি এসে পৌঁছুবেন আমেরিকায়। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে ভারতের আত্মবিশ্বাস এবং পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে তার অনাগ্রহ। ইদানীং যেসব উগ্র ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম তার লক্ষ্য মনে হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই শুরু করলে যে চড়া মূল্য পাকিস্তানকে দিতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেওয়া।

এটা সুস্পষ্টতই অনুধাবন করা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আগামীকাল শ্রীমতী গান্ধী যখন সাক্ষাৎ করবেন তখন তিনি কঠোর নীতিই মেলে ধরবেন। তবে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন সাড়া পাবেন কিনা সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এখানকার বিশ্লেষকদের মতে ওয়াশিংটনের স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য মনে হচ্ছে উপমহাদেশের সঙ্কট যেন পিকিং ও মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে প্রেসিডেন্টের বিশ্বজনীন পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে না পারে, সেটা দেখা।

মার্কিন উষ্মা

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক মন্তব্যসমূহে ভারতের সর্বশেষ অবস্থান নিয়ে হোয়াইট হাউজের ক্রমবর্ধমান উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের এইসব পদক্ষেপের

ভেতরে রয়েছে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক গ্রহণে অসম্মতি, পূর্ব পাকিস্তানে 'তাদের বর্বরতা' থামিয়ে পাকিস্তান যতদিন পর্যন্ত না শরণার্থী প্রবাহ বন্ধ করে ততদিন পর্যন্ত সীমান্ত থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত নেতৃত্বের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আলোচনার কিছু নেই—এই বক্তব্যের ভিত্তিতে জাতিসংঘ অথবা তৃতীয় দেশের মধ্যস্থতা গ্রহণে তাদের আপত্তি। মার্কিন কর্মকর্তারা আড়ালে-আবডালে এখন বলে থাকেন যে, ভারত তার পুরনো শত্রু পাকিস্তানকে দুর্বল করতে আগ্রহী; পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বিদ্রোহীদের সহায়তা ভারতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রদত্ত হয় নি, বরং পাকিস্তানের সংহতি-নাশ ত্বরান্বিত করাই এর উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে মার্কিন কর্মকর্তারা যা বলছেন, তা হলো, ভারত যুক্তির পথে চলছে না।

তবে এখানকার বেশির ভাগ কূটনীতিক একদিকে যেমন স্বীকার করছেন যে ভারতের নীতি আরো শিথিল করার সুযোগ থাকা দরকার ছিল, তেমনি এটাও বলছেন যে, অযৌক্তিক অবস্থান নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাঁরা উল্লেখ করছেন যে, আমেরিকানরা ভারতকে সংযত থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন অথচ তাকে কোনো ধরনের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন না এবং পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার মূল উৎপাটন ও সেই সূত্রে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী-সৃষ্ট চাপ অপসারণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও দিচ্ছেন না। সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, এইসব কূটনীতিকে মতে, পাকিস্তানের সামরিক অপারেশনের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখে ওয়াশিংটন নিজেকে পাকিস্তানের সমর্থক প্রতীয়মান করেছে। এক কূটনীতিক বললেন, 'যে কূটনৈতিক উদ্যোগ মূল সমস্যার প্রতি সহানুভূতি অথবা কোনো ইতিবাচক প্রস্তাবনা ছাড়া শুধু সংযত থাকার পরামর্শ দেয়, তার সাফল্য সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে।'

সফর শুরুর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেছেন, 'আপনারা জানেন সকলেই আমাদের সংযত আচরণের প্রশংসা করছেন। আমরা পাচ্ছি মৌখিক প্রশংসা আর যারা সংযত নেই তারা পাচ্ছে অস্ত্রের সহায়তা।'

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসার পাশাপাশি সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন শিখর স্পর্শ করেছে। আগস্ট মাসে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং পাকিস্তানি আক্রমণ ঘটলে মস্কো ভারতের পক্ষে থাকবে এই আশ্বাস প্রদান করে রুশিরা একদিকে শোভনভাবে ভারতকে সংযত থাকার পরামর্শ দিতে পারছে এবং অপরদিকে কেবল ভারতে নয়, পূর্ব পাকিস্তানেও তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন না করেই তারা এইসব করতে সমর্থ হয়েছে এবং পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেন ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পর তাশখন্দের মতো এবারও মস্কো মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের সম্ভাব্যতা দেখতে পাচ্ছে।

ভারত-মার্কিন সদিচ্ছার ভাণ্ডার ফুরিয়ে এলেও একেবারে শূন্য হয়ে যায় নি। তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধ যদি শুরু হয় তবে ভারতীয়দের অনেকে আমেরিকাকে পরম শত্রু হিসেবে বিবেচনা করবে।

এখানে বিশ্লেষকরা সবাই একমত যে আগামী এক-দুই মাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে

না। তবে তাঁরা এটাও মনে করেন পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টেও যেতে পারে—এটা নির্ভর করছে পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও বিশ্বসমাজ কতটা এগিয়ে আসে, তার ওপর।

বিদেশী পর্যবেক্ষকরা উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছেন। একদিকে ভারতের সহায়তায় বাঙালি বিদ্রোহীরা পাক আর্মির ওপর চাপ বৃদ্ধি করবে, অপরদিকে আর্মিও তাদের উৎখাত করার প্রচেষ্টা জোরদার করবে। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন আমেরিকায় শ্রীমতী গান্ধীর লক্ষ্য হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে এটা বোঝানো যে তিনি যদি পাকিস্তানকে বর্তমান নীতি পরিবর্তনে সম্মত করাতে না পারেন তবে যুদ্ধ পরিহার করা হয়তো সম্ভব হবে না। ওয়াশিংটনে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ও টেলিভিশনে ভাষণ দানের সুবাদে ৫৩ বৎসর বয়েসী প্রধানমন্ত্রী মার্কিন জনমতকে সংগঠিত করে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টিরও প্রয়াস নেবেন।

কয়েক মাস আগে এখানকার এক ইউরোপীয় কূটনীতিক মন্তব্য করেছিলেন, 'পাকিস্তান জলে নিমজ্জমান কুকুর। তার মাথা চেপে আর ডুবিয়ে দেওয়ার দরকার নেই ভারতের।'

তবে পাকিস্তান ভারতের প্রতি সজোরে ঘেউ ঘেউ করছে ঠিকই, অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, হুমকি বোধ করলে ভারতও ধাক্কা লাগাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ডেটলাইন : বাগদা, ভারত
নভেম্বর ২৩, ১৯৭১

সীমান্তে এগিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় সামরিক বহর, যশোর এলাকায় পাকিস্তানের দুর্বল প্রতিরোধ

আজ বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য এখান থেকে নিকটবর্তী পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের দিকে এগিয়ে গেছে এবং তাদের অফিসারদের মতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে।

সীমান্ত থেকে ছয় মাইল দূরের এই শহর দিয়ে সৈন্যরা এগিয়ে গেছে কামান, জলচর যান এবং খাদ্য ও গোলাগুলির পূর্ণ সরবরাহ নিয়ে। ভারতীয় অফিসাররা জানাচ্ছেন যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের এই সেক্টরে খুব একটা শক্ত প্রতিরোধ দাঁড় করাচ্ছে না। সেক্টরটি হলো বয়রা সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে ২০ মাইল দূরের যশোর শহর-কেন্দ্রিক বিশাল এলাকা।

বর্তমান সংবাদদাতাকে ছয় মাইল উত্তরে বয়রার দিকে এগোতে দেওয়া হয় নি। তাই ভারতীয় সৈন্য আসলেই পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে কি না সেটা প্রত্যক্ষ করা যায় নি। তবে এখানে বয়রার অভিযান-সূচনা কেন্দ্রে যেসব অফিসার রয়েছেন, তাঁদের কেউ প্রমাণাদি গোপন করার চেষ্টা করেন নি যে বাঙালি বিদ্রোহীদের সূচিত আক্রমণাভিযানের সমর্থনে-নামা ভারতীয় সৈন্যরা সীমান্ত পার হয়ে অ্যাকশন চালাচ্ছেন।

জোরদার মনোবল

একজন অফিসার বললেন, 'এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক মাস ধরে অপেক্ষায় আছে আমার লোকেরা। তাঁদের মনোবল খুব জোরদার।' অন্যান্য বিদেশী সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, তাঁরা বনগাঁর কয়েক মাইল দক্ষিণের রাস্তায় সেনাবাহী জলচর যানসহ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল বহরকে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছেন।

এদিকে নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা

সংসদে উল্লসিত সদস্যদের অবহিত করেছেন যে, গতকাল ভারতীয় ন্যাট জঙ্গি বিমানগুলো তিন–চারটি পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত করেছে। গতকাল বিকেলে বয়রার কাছে এই পাকিস্তানি প্লেনগুলো ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করেছিল। কর্মকর্তারা আরো জানিয়েছেন যে বিধ্বস্ত বিমানের তিনজন পাকিস্তানি পাইলটের মধ্যে দু'জন ধরা পড়েছে। তবে রাওয়ালপিন্ডিতে একজন পাকিস্তানি মুখপাত্র জানিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায় সঙ্ঘটিত আকাশ–যুদ্ধে উভয় পক্ষের দু'টি করে বিমান ঘায়েল হয়েছে।

বয়রায় যেসব সামরিক যান সীমান্তের দিকে যাচ্ছে তার সবগুলো ক্যামোফ্লেজ করা এবং পাগড়ি–বাঁধা বহু শিখসহ সব সৈন্যই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমেত পুরো যুদ্ধসাজে রয়েছে।

যানবাহনের অধিকাংশই সেনাবাহিনীর অধিকৃত বেসরকারি ট্রাক। তাতে বহন করা হচ্ছে সেতুর সাজসরঞ্জাম থেকে শুরু করে কম্যান্ড পোস্টের আসবাব পর্যন্ত, বড়োসড়ো যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু। ভারতীয়রা জলচর যানও নিয়ে যাচ্ছে এবং দৃশ্যত কিছু ট্যাঙ্কও।

এখানে সদ্য স্থাপিত ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সংবাদদাতা দুই ঘণ্টারও কম সময়ে শত শত ভারতীয় নিয়মিত সৈনিককে ট্রাকবহরে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছেন। ট্যাঙ্কবাহী একটি ফাঁকা যান সীমান্তের দিক থেকে ফিরে এলো। দূরে ভারি কামানের গোলা নিক্ষেপের শব্দ ভেসে আসছে। এই সংবাদদাতা ফিরে আসার সময়েও সেনাবহরের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। যে ভারতীয় সেনাদল পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ছে তাদের সংখ্যা তাই নিশ্চিতভাবেই কয়েক সহস্র হবে।

আজ অধিক রাতে বিশ্বস্ত সূত্রে কলকাতায় যেসব খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, ভারতের দু'টি পদাতিক ব্রিগেড ও একটি আর্মার্ড্ রেজিমেন্ট যশোর জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। যশোরে পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণাধীন বিমানবন্দর কামানের গোলার আওতায় এসে গেছে।

এই রিপোর্ট অনুয়ায়ী ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে ব্যাপক আক্রমণ ঘটেছে যশোর, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায়।

বাগদায় ভারতীয় অফিসাররা জানিয়েছেন যে, অভিযানের সুবিধার্থ পূর্ব পাকিস্তানকে পাঁচটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে এবং তাঁরা অনুমান করেন অন্যান্য সেক্টরেও যশোরের মতো অভিযান ভালোভাবে এগিয়ে চলছে। একজন অফিসার জানালেন, তিনি মনে করেন, যশোরের অভিযান এক সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত হবে।

ভারত যে পূর্ব পাকিস্তানে পুরোদস্তুর আক্রমণ–অভিযান শুরু করেছে, পাকিস্তানের এই অভিযোগ ভারত শুধু অস্বীকারই করছে না, তাদের সৈন্যরা যে সীমান্ত অতিক্রম করেছে এটাও তারা মেনে নিচ্ছে না। সরকার এখনো বলে চলেছে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে জোর লড়াই চলছে তা একান্তভাবে পাকিস্তান আর্মি ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে ঘটছে।

নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুক্তিবাহিনী লড়াইয়ের সঙ্গে ব্যাপকভাবে

যুক্ত, তবে দৃশ্যমান প্রমাণাদি এই ইঙ্গিতও দেয় ভারতের ভূমিকা মুখ্য না হলেও ব্যাপক তো বটেই। ভারত নয়টি পদাতিক ডিভিশন ও দুইটি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট নিয়ে আক্রমণ রচনা করেছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে, এখানকার অধিকাংশ বিদেশী কূটনীতিক ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক তাকে অবশ্য অতিরঞ্জিত বলে নাকচ করে দিয়েছেন। ভারত 'অঘোষিত যুদ্ধ' শুরু করেছে বলে জাতিসংঘে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে আজ পার্লামেন্টে ভারত সরকার তা অস্বীকার করেছে।

প্রতিরক্ষা শিল্প সংক্রান্ত মন্ত্রী ভি.সি.শুক্লা বলেছেন, 'এমনটা বলার অর্থ পাকিস্তানের প্রচারণার ফাঁদে পড়া এবং বাংলাদেশ সঙ্ঘাতের আন্তর্জাতিকীকরণ প্রয়াস ও জাতিসংঘকে জড়িত করার প্রচেষ্টার শিকার হওয়া।'

আজ বিকেলে বাগদায় আর্মি হেডকোয়ার্টারের কম্পাউন্ডে ব্যস্তসমস্ত সংবাদবাহকদের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেল। কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে গেল রিকয়েললেস বন্দুক-বসানো তিনটি জিপ। জিপে আসীন পোড়খাওয়া শিখ সৈনিকরা, গাড়ির বহরের ধুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁদের মুখে পাগড়ির খুঁট প্যাঁচানো রয়েছে। সীমান্তের দিক থেকে ফিরে এলো এক-ইঞ্জিনবিশিষ্ট ভারতীয় পরিদর্শক বিমান। স্কুল ভবনের বারান্দায় বসে আছেন চিকিৎসাদলের সদস্যবৃন্দ, অপেক্ষা করছেন আহতদের আগমনের। এখানকার সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যা বিশেষ কম এবং অন্তত বাগদাতেও এর বিপরীত কোনো লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় নি। সীমান্ত এলাকায় আজ সারাদিনের ঘোরাঘুরি করেও বর্তমান সংবাদদাতা দেখতে পান নি কোনো বি.এস.এফ সদস্যের—এই আধা-সামরিক বাহিনীই বরাবর সীমান্ত পাহারা দিয়ে থাকে। সৈন্যদের সকলেই নিয়মিত বাহিনীর লোক। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাউকেও এই অঞ্চলে দেখা যায় নি। ভারতীয় সৈন্যদের বেশিরভাগই কোনো বিদেশীর সঙ্গে কথা বলতে অনিচ্ছুক। তবে গাড়িতে সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় তাঁদেরকে বেশ প্রত্যয়ী মনে হলো, এমন কি কিছুটা উৎফুল্লও। সীমান্তের নাজুক এলাকাগুলোতে বিদেশী সাংবাদিকদের গমন নিষিদ্ধ করে কয়েক সপ্তাহ আগে জারিকৃত ঘোষণা বহাল থাকলেও সৈন্য চলাচলের এই ডামাডোলের ভেতর নির্বিঘ্নে সেনা তৎপরতার ঘনিষ্ঠ অবলোকন সম্ভব হয়েছিল। এই সংবাদদাতা প্রথম থামেন বাগদা থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে ভারতের পেট্রাপোল সীমান্তের কাছে সৈন্যদের অবস্থানে। এখানে গভীর বাঙ্কার খুঁড়ে যে ভারতীয় সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিল তারা জানালো মুখোমুখি অর্ধবৃত্তাকারে রয়েছে প্রায় ২০০ পাকিস্তানি সৈন্য এবং যশোর অভিমুখী সড়কের প্রথম অংশটুকু তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। তখন বেলা একটার সময় অবস্থানটি বেশ নীরব, মাঝেমধ্যে কেবল একজন পাকিস্তানি রাইফেলধারীর গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

অফিসাররা অতিথিদের কমলার রস দিয়ে আপ্যায়িত করলেন এবং এখানকার পরিস্থিতি কি রকম শান্ত সে-বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। তাঁরা বললেন যে, যশোর জেলার অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর একটি অভিযান সম্পর্কে তাঁরা শুনেছেন তবে এই এলাকায় তার কোনো জের উপচে পড়ে নি। আরো জানালেন যে, লড়াইয়ের সঙ্গে কোনো ভারতীয় সৈন্য জড়িত নয়। তাঁদের কথাবার্তার সময় অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ভারি গোলার গুড়ুম গুড়ুম শব্দ

শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আরো কয়েক মাইল যাওয়ার পর বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখি ১২টি ট্রাকের এক বহর। প্রত্যেক ট্রাকের ওপর রয়েছে একটি করে ১৩৫ মি. মি. কামান। বহরটি যাচ্ছে পেট্রাপোলের দিকে।

তিন ঘণ্টা পর বিকেল পাঁচটার দিকে কলকাতা ফিরে আসার সময় সফরকারীরা শুনতে পান পেট্রাপোলের দিক থেকে ভেসে আসা ভারি কামানের থেকে থেকে গোলাবর্ষণের শব্দ। কখনো কখনো পরপর পাঁচ–ছয়টি গোলাবর্ষণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকজনদের অনেকে বললেন, তাঁরা অনুমান করছেন সম্মুখস্থ পাকিস্তানি কম্পানিকে অবস্থানচ্যুত করে ট্রাক ও ট্যাঙ্কের চলাচলের জন্য যশোর রোড খুলে দিতে ভারতীয় সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করছে। বর্তমান সংবাদদাতা পুনরায় পেট্রাপোল ফিরে যাবার চেষ্টা নিলে এবার স্থানীয় পুলিশ পথরোধ করে। তারা জানায় যে এটি নিষিদ্ধ এলাকা। জোর সামরিক তৎপরতা ও সীমান্তের কাছ থেকে যুদ্ধের গোলাগুলির শব্দ সত্ত্বেও সর্বত্রই ভারতীয় গ্রামবাসীদের অবিচলিত মনে হচ্ছে। কখনো হয়তো–বা গ্রামের চাষী দাঁড়িয়ে পড়ে তাকিয়ে দেখে ট্যাঙ্কবাহী অতিকায় যান, তবে এটা বিশেষ ব্যতিক্রম। যে–রাস্তা দিয়ে সেনাদল যাচ্ছে তার পাশের খালের জলে ছেলেরা সাঁতার কাটছে। মেয়েরা শাড়িকাপড় ধুচ্ছে এবং পুরুষেরা রৌদে শুকোবার জন্য মেলে দিচ্ছে রুপোলি পাট।

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
নভেম্বর ২৪, ১৯৭১

অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করেছে ভারত, বলেছে এটা আত্মরক্ষামূলক

ভারত আজ প্রথমবারের মতো স্বীকার করেছে যে, পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে তার সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে, তবে বলেছে যে এটা একবারই ঘটেছে,—বিগত রবিবার—এবং শুধু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। নয়াদিল্লিতে সংসদে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই স্বীকারোক্তি করেন এবং সেদিনকারই বিলম্বিত প্রহরে এক প্রেস ব্রিফিং–এ সরকারি মুখপাত্র এর সবিস্তার বর্ণনা দেন।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া রয়েছে তারা যেন আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া সীমান্ত অতিক্রম না করে। সরকারি মুখপাত্র বলেন যে, এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ভারতীয় ডিভিশন নেই এবং সেখানে গোটা যুদ্ধটা চলছে পাকিস্তানি ও স্বাধীনতাকামী বাঙালি বিদ্রোহীদের মধ্যে।

পাকিস্তানি আক্রমণের অভিযোগ

প্রধানমন্ত্রী ও সরকারি মুখপাত্র উভয়ে বলেছেন যে, কলকাতা থেকে ২৫ মাইল দূরে বয়রা এলাকায় ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে পাকিস্তানি আক্রমণ ঠেকাতে গত রবিবার ভারতীয় বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করেছে। পার্লামেন্টে প্রদত্ত বিবৃতিতে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 'পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমগুলো গালগল্প জুড়ে বসেছে যে ভারত অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং ট্যাঙ্ক ও সৈন্য নিয়ে বিশালাকার আক্রমণ শুরু করেছে। এসব পুরোপুরি অসত্য।'

সীমান্ত এলাকায় বিদেশীদের গমনাগমনের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি ভারতীয় বাহিনীর সীমান্ত অতিক্রমের এই স্বীকারোক্তি প্রদত্ত হলো। ঐ নিষেধাজ্ঞা জারির মূল কারণ হলো বিদেশী সাংবাদিকদের

সৈন্য চলাচল প্রত্যক্ষ করা থেকে বিরত রাখা।

গতকাল বর্তমান সংবাদদাতা সীমান্ত থেকে ছয় মাইলেরও কম দূরত্বে বয়রায় ভারতীয় সৈন্য ও অস্ত্রপাতির বিরাট বহরকে সীমান্তের দিকে যেতে দেখেছে। এই সীমান্ত সংলগ্ন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের যশোর জেলা এবং গত সপ্তাহান্তে ভারতের সমর্থনে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণাভিযান শুরুর পর এখানটাতেই সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ ঘটেছে। তাদেঁর বাহিনী যে যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে এই সত্য রাখঢাক করার কোনো চেষ্টা অত্র এলাকার ভারতীয় অফিসাররা করেন নি।

জোর লড়াইয়ের সংবাদ

একদিকে বিদেশী সংবাদদাতাদের সঙ্ঘাতপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে ভারতীয় সাংবাদিকরা সীমান্ত অতিক্রম করে যাওয়া সম্পর্কে কিছুই রিপোর্ট করছেন না, এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে লড়াইয়ের বিস্তারিত খবর বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে জোর লড়াই চলছে যশোর, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেটে। প্রধান লক্ষ্য মনে হচ্ছে যশোর ও সিলেট শহর অধিকার করা। যশোর বিমানবন্দরে গোলা বর্ষিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বিদ্রোহী বাংলাদেশ সরকারের সূত্র জানিয়েছে যে যশোরের উত্তরে মেহেরপুরের যুদ্ধে গেরিলাদের সমর্থন যুগিয়েছে ভারতীয় ট্যাঙ্ক।

ইয়াহিয়া খানকে ভর্ৎসনা

গতকাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জারি করা জরুরি অবস্থা সম্পর্কে পার্লামেন্টে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, 'বাংলাদেশের ওপর থেকে বিশ্বজনমতের দৃষ্টি অন্যত্র ফেরানো এবং স্বয়ংসৃষ্ট পরিস্থিতির দায়ভার অন্যের ওপর চাপানোর উদ্দেশ্যে তাঁর (প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান–এর) প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ এটা।'

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যে, ভারত কেবল পাকিস্তানের মাসাধিককালব্যাপী যুদ্ধংদেহী পদক্ষেপের মোকাবেলা করছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অক্টোবরে সীমান্ত জুড়ে সৈন্য মোতায়েন এবং পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত সামরিক অ্যাকশন, যার ফলে ভারতে পালিয়ে এসেছে নব্বই লক্ষ শরণার্থী।

তিনি বলেন, 'পরিস্থিতির অবনতি ঘটুক কিংবা সংঘর্ষ শুরু হোক এটা কখনোই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এখন পর্যন্ত আমরা সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছি আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত যেন সীমান্ত অতিক্রম করা না হয়।'

বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে তিনি বলেন, 'যদিও পাকিস্তান জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে তা সত্ত্বেও আমরা তুলনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবো, যদি না পাকিস্তানের অধিকতর আগ্রাসী প্রচেষ্টা জাতীয় স্বার্থে আমাদের তা করতে বাধ্য করে।

'একই সময়ে দেশকে থাকতে হবে অবিচল। আমাদের বীর সেনাবাহিনী ও জনগণ এটা নিশ্চিত করবে যে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের যে–কোনো অ্যাডভেঞ্চারবাদী

প্রচেষ্টার উপযুক্ত জবাব তারা পাবে।

'পাকিস্তানের শাসকদের এটা উপলব্ধি করতেই হবে যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পদদলিতকরণ এবং যুদ্ধের চেয়ে শান্তির পথ—শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও সমঝোতা—অনেক বেশি ফলদায়ক।'

সাংবাদিকদের অবহিত করার সময় ভারতীয় মুখপাত্র বলেছেন যে, গত রবিবার সীমান্ত অতিক্রমকালে ভারতীয় ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য বাহিনী ১৩টি পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

সীমান্ত অতিক্রমের এটাই প্রথম ঘটনা হিসেবে ভারতীয় বক্তব্য সত্ত্বেও এখানকার সরকারি সূত্রে এ-খবরের সমর্থন মেলে যে গত কয়েক সপ্তাহে ভারতীয় সৈন্যরা সংঘর্ষকালে বেশ কয়েকবার সীমান্ত পার হয়ে গেছে।

গত রবিবার ভারতীয় সৈন্যরা কতটা ভেতরে ঢুকেছিল এই প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন, 'কতদূর তা আমি বলতে পারবো না। তবে এটা স্বল্প দূরত্বের।'

ভারতীয়রা সীমান্ত পার হয়ে কতটা ভেতরে যাবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, এ ক্ষেত্রে সীমানা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়।

কোন্ স্তরে সীমান্ত পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেটা ঠিক করবেন সংঘর্ষস্থলে অবস্থিত ব্যক্তি—নিচের দিকে একক সৈন্যটি অবধি।

সীমান্তের কাছে বিরাট বহর

সীমান্ত এলাকা থেকে কলকাতায় আসা ভারতীয় নাগরিকরা খবর জানাচ্ছেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ছে। সীমান্তের ওপার থেকে, বিশেষভাবে রাতে, ভারি গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়ার কথাও তাঁরা জানান।

আজ কলকাতা থেকে সীমান্তের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে ৫০তম ছত্রী ব্রিগেডের অন্তত পঞ্চাশটি গাড়ির এক বহর। ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রিকয়েললেস রাইফেল ও যাবতীয় অস্ত্রপাতি। হেলমেটধারী সৈন্যরা সব যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, ক্যামোফ্লেজ করা।

কলকাতা বিমানবন্দরকে অর্ধ-নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থাধীনে আনা হয়েছে এবং প্লেনের ওঠানামার পথ কিছুটা পাল্টানো হয়েছে, যাতে বিমানগুলো সীমান্ত থেকে অন্তত দশ মাইল দূরে থাকে।

ক্রমেই আরো বেশি করে সীমান্ত এলাকা সকাল-সন্ধ্যা কারফিউয়ের আওতায় আনা হচ্ছে।

বিদেশী সাংবাদিকদের ওপর বাধা-নিষেধ

আজ ভারত সরকার প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় তথ্যের স্বাধীনতা যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকটাতে সরকারের মনোযোগ রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় গমনে সংবাদদাতাদের বর্ডার পারমিট প্রদান যাতে দ্রুততর করা যায় এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলা হয় যে, এমনি অনুমোদন প্রদত্ত হবে 'জনস্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক সম্ভাব্যতার নিরিখে'।

তবে বর্তমান সংবাদদাতাসহ আরো কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক সীমান্তের কাছে

যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বারাসাতে তাঁদের পথ রোধ করে, কলকাতার কেন্দ্র থেকে এই স্থান মাত্র ১৮ মাইল দূরে। পুলিশ জানায় যেসব বর্ডার পারমিট সবেমাত্র ইস্যু হয়েছে সেসব বাদে বাকি সব বাতিল বলে গণ্য হবে—এই মর্মে তারা নতুন নির্দেশ পেয়েছেন। একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, এই নিষেধাজ্ঞা জারির কারণ গতকাল যেসব সংবাদদাতা সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান অভিমুখী ভারতীয় সৈন্যদের দেখতে পেয়েছেন।

বর্তমান সংবাদদাতার মেঘালয় গমনের পারমিটও বাতিল হয়েছে একই কারণে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব অশোক কাপুর তা দিতে সম্মত হন নি। তিনি বললেন, 'আপনি সদাচারণ করেন নি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি নীতিভঙ্গ করেছেন।'

ডেটলাইন : যশোর
ডিসেম্বর ৮, ১৯৭১

'মুক্ত' যশোরে বাঙালিদের নৃত্য

বাসের ছাদে বাঙালিরা নৃত্যপর। রাস্তায় তারা জোরগলায় স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছে। তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গন করছে, উল্লাস ধ্বনি দিচ্ছে এবং বিদেশী দেখলে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশের জন্য এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরছে।

বাঙালিদের জন্য আজ (৮ ডিসেম্বর) হচ্ছে যশোরের 'মুক্তি দিবস'—বিগত আট মাস যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ যে শহর ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে, বাঙালি বিদ্রোহ দমনের জন্য গত বসন্তে এইসব সৈন্য এখানে এসেছিল।

'মুক্তিদাতা' হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, যে বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারত সমর্থন করছে তাঁদের মতোই উল্লসিত এই সেনাবাহিনী। তবে অগ্রগতি থামিয়ে আনন্দ-উৎসব করার মতো সময় তাঁদের নেই। পশ্চাদপসরণরত পাকবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে চলেছে তাঁরা দক্ষিণ-পুবে খুলনার দিকে।

যশোর থেকে চার মাইল দূরে খুলনা রোড ধরে এগোবার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে ভারতীয় বাহিনী। ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ির ওপর বসে ভারতীয়রাও হাসছে, হাত নাড়ছে, ছবির জন্য পোজ দিচ্ছে।

পাকিস্তানি সৈন্য সম্পর্কে সপ্তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক পদাতিক ক্যাপ্টেন বললেন, 'ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাচ্ছে। ওদের হাতে ভালো অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ভালো। কিন্তু মনের জোর একেবারেই নেই।'

প্রধানত পাঞ্জাবিদের নিয়ে গঠিত পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালিদের থেকে যতো আলাদা, অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্যও তেমনি। কেননা ভারতীয় বাহিনীতেও পাঞ্জাবিদের আধিক্য। তবে বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও

তাঁদের সমর্থক ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ফারাক সাময়িকভাবে মুছে গেছে।

সোৎসাহী বাঙালিরা ভারতীয় অগ্রাভিযান বহাল রাখতে সৈন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে নদীর ওপর পন্টুন সেতু স্থাপনায়, পশ্চাদপসরণকারী পাকিস্তানিরা স্থায়ী সেতু উড়িয়ে দিয়েছে।

ভারতীয় সীমান্ত থেকে ২৩ মাইল ভেতরে যশোরের পথে একটি প্রধান সেতু কুশলী হাতে ধ্বংস করা হয়েছে। ইস্পাত ও কংক্রিটের সেতুর ছয়টি স্প্যানের পাঁচটিই মুখ থুবড়ে কপোতাক্ষ নদে পড়ে আছে। পাশের রেল সেতুরও একই দশা।

দুই রাত আগে যশোরের দিকে পিছু হটে যাওয়ার সময় পাকিস্তানিরা এই কাজ করেছে।

যশোর থেকে নয় মাইল দূরে ঝিকরগাছায় এখন যে দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে সেটাকে বালতি-ব্রিগেড ও পিরামিড নির্মাণ কাজের সমন্বয় বলা যেতে পারে।

বিধ্বস্ত সেতুর নিচে কাদাভর্তি নদীর পাড়ে লম্বা সারিতে দাঁড়ানো শত শত বাঙালি নতুন পন্টুন সেতু পাতার কাঠের গুঁড়ি এগিয়ে দিচ্ছে। তাদের মেশিনের মতো নিখুঁত কাজের পাশাপাশি আর্মি প্রকৌশলী দলের তামাটে সৈন্যরা হাঁটুজলে নেমে ফোলানো বিশাল পন্টুন ভাসিয়ে দিচ্ছে এবং এর ওপর বসিয়ে দিচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের স্প্যান। চার ঘণ্টার মধ্যে সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হলো।

সবাইকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত খুশি—ভারতীয় সৈনিক, বাঙালি শ্রমিক, মায় পথিপার্শ্বের তদারককারীরাও।

পাকবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে যাঁরা পালিয়ে গিয়েছিল এবং এখন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে, সেইসব বন্ধু ও আত্মীয়ের হর্ষোৎফুল্ল পুনর্মিলনে মুখর হয়ে উঠছে ঝিকরগাছা। কেউ কেউ ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, অন্যরা লুকিয়েছিল দেশের আরো ভেতরে।

পুরনো বন্ধু

পুরনো সেতুর অক্ষত একটি স্প্যানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাকালে বর্তমান সংবাদদাতারও এক পুনর্মিলনী ঘটে। ইংরেজিতে শোনা গেল কণ্ঠ, 'আমাকে আপনার মনে আছে কি?' নিশ্চয় মনে আছে। ইনি হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট আখতার-উজ-জামান, বাঙালি বিদ্রোহী, মুক্তিবাহিনীর একটি কম্পানির কম্যান্ডার।

একমাস আগে তাঁকে দেখি যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিমে গেরিলাদের দখলকৃত একটি এলাকায়। তিনি তখন বলেছিলেন যে, যুদ্ধে জয়ী হতে মুক্তিবাহিনীর অন্তত দুই বৎসর সময় লাগবে। আজ তিনি বললেন, 'সেটা হতো যদি আমরা একা লড়তাম। এখন তো আমরা বিরাট সাহায্য পাচ্ছি।'

হঠাৎ তিনি বললেন, 'এটা আমার জন্য একটা ঐতিহাসিক সেতু, জ্যোৎস্নারাতে বান্ধবীকে নিয়ে আমি এখানে আসতাম নদীতে নৌকোয় করে ঘুরে বেড়াবার জন্য।' পুরনো স্মৃতি মনে করে তিনি হাসলেন।

বাস থেকে চিৎকার

যশোরের পরিস্থিতি আরো উল্লাসমুখর। কয়েক মাইল দূরের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ভারতীয় সাঁজোয়া বহর যখন এগিয়ে চলছে মানুষ–ভর্তি বাস থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল, 'স্বাধীন বাংলা শেখ মুজিব'—পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী পূর্ব পাকিস্তানি নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য উল্লাসধ্বনি।

রাস্তায় নাচছে কতক বাঙালি বালক। অনেক ভবন ও বাড়ির ছাদে পতপত করে উড়ছে বাংলাদেশের লাল, সবুজ ও সোনালি পতাকা। আনন্দে–উদ্বেল হৈ–হট্টগোলের মধ্যেও একটা বিষণ্নতার সুর লেগে রয়েছে। রাস্তায় যত ভিড়ই হোক এটা হলো শহরের আদি ৩০,০০০ মানুষের এক ভগ্নাংশ মাত্র। নিখোঁজদের কেউ কেউ আর ফিরবে না। অন্যরা নিহত হয়েছে। মিশনারি ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে পাকবাহিনী যশোরের ৫০০০ মানুষকে হত্যা করেছে।

যাচাই–করা–কঠিন বিভিন্ন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে পশ্চাদপসরণরত পাক বাহিনী হত্যা ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

এক ভারতীয় অফিসার বললেন যে, যশোরের এক শহরে পাকিস্তানিরা একজন বালককে জীবন্ত কবর দিয়েছে। ঝিকরগাছায় লোকজন জানালেন যে, কিছু স্কুল ছাত্রকে গুলি করে মারা হয়েছে।

যশোর শহরের ঠিক বাইরে রাস্তার ধারের মাঠে একটি মৃতদেহ পড়ে ছিল। লাশের বাঁ হাত কাটা, বুকে দগদগে ক্ষতচিহ্ন। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানালেন যে, পাকিস্তানি অবস্থান সম্পর্কে ভারতীয়দের কাছে তথ্য পাচারের জন্য পাকবাহিনী একে খুন করেছে। ভারতীয় অভিযানে যশোর এবং এর সামরিক ক্যান্টনমেন্টের সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। দৃশ্যত এর কারণ হলো মূল লড়াইটা হয়েছে শহরের উত্তরে, দুর্গাবতী নামক স্থানে।

নর্থ–ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল দলবীর সিং, যাঁর বাহিনী যশোর দখল করেছে, বললেন যে, দুর্গাবতীতে পাকিস্তানিরা প্রায় উন্মাদগ্রস্তের মতো সাহসী লড়াই করেছে। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা একবার যখন পাক–প্রতিরোধ ভেঙে দিল তখন তারা দ্রুত পিছু হটতে থাকে। এরপর ক্যান্টনমেন্টে অথবা শহরে রুখে দাঁড়াবার আর কোনো চেষ্টা তারা নেয় নি ।

ক্যান্টনমেন্টে তাঁর হেডকোয়ার্টারে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি বলেন যে, গতকাল দুপুরের মধ্যে গোটা এলাকার অবরোধ তিনি সম্পন্ন করে ফেলেন। একদল পাকিস্তানি সৈন্য খুলনার পথে ১৫ মাইল হটে গেছে। তবে ৩০০ সৈনিকের আরেকটি দলকে যশোর থেকে চার মাইলের মধ্যে তাঁর সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন করে ঘেরাও করে ফেলে।

যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে গাড়িতে করে এবং হেঁটে–ঘুরে–বেড়িয়ে দেখা পাওয়া গেল মাঝারি আকারের ১৪টি ট্যাঙ্ক ও ৪০টি সাঁজোয়া গাড়ির বহর, যাতে প্রায় ৪০০–৫০০ সৈন্য হবে। এরা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরুর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। পাশে কতকগুলো অ্যাম্বুলেন্সও দাঁড় করানো রয়েছে।

ভারতীয় কর্মকর্তারা বেশ জোরের সঙ্গে বলছেন যে, তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে খুব

সামান্য, তবে যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে এসে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পাকিস্তানি পক্ষে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ঘটলেও ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও এর মাত্রা সরকারি হিসেব থেকে যথেষ্ট বেশি হবে।

ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বহর থেকে সামান্য দূরে, যেখান থেকে শোনা যাচ্ছে মেশিনগান ও মর্টারের গোলাগুলির শব্দ, একজন আর্মি ডাক্তার তাঁর সহযোগীকে বলছিলেন, 'সবকিছু ঠিক করে রাখো। ৪০–৫০ জন আহত এসে হাজির হবে।'

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে একজন আহত পাকিস্তানি সৈন্যকে। তার বুকে ও বাঁ হাতে গুলি লেগেছে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যরা স্ট্রেচারে করে যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম সৈন্যটি গোঙাচ্ছিল, 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ।'

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
ডিসেম্বর ১১, ১৯৭১

বড় কথা হচ্ছে পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণা

যে কোনো যুদ্ধের মতো সবকিছু এখানে রয়েছে—ভালো লোক আর খারাপ লোক, মুক্তিদাতাদের বুকে টেনে নিচ্ছে হর্ষোৎফুল্ল সাধারণ মানুষ, আনন্দে বিসর্জন করছে অশ্রু—যুদ্ধে পরাজিত যে খারাপ লোকেরা তারাও, লোকবলে অস্ত্রবলে বিপুল শক্তিশালী পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, লড়াই ও মৃত্যুবরণ করার জন্যে অনিচ্ছুক সম্মান আকর্ষণ করেন।

এবং এর অঙ্গাঙ্গী অংশ হিসেবে রয়েছে একটি জাতির জন্ম। জাতিগতভাবে ভিন্ন, শ্রেণীগতভাবে অবজ্ঞা প্রকাশকারী শোষকদের দীর্ঘ শাসন-শোষণ জনগণ এখন উৎখাত করতে চলেছে ভারতীয়দের সহায়তায়। সংক্ষেপে বলতে অল্প কিছুকাল পরে এই ভূখণ্ড হয়ে উঠবে বাংলাদেশ, ৭৫ মিলিয়ন মানুষ একে করে তুলবে বিশ্বের সপ্তম জনবহুল রাষ্ট্র।

ভারতীয় সেনাবাহিনী, যাঁরা ইতিমধ্যে দেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আঞ্চলিক রাজধানী ঢাকার দিকে এগিয়ে চলছে, কীভাবে এত দ্রুত সেটা করতে পারলো ?

শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকার কথা ছিল পাকিস্তানিদের। গোটা দেশে আঁকিবুঁকি করে আছে গতিপথচঞ্চল নদী ও খাল। ভূভাগের অধিকাংশ হচ্ছে নরম ও জলাভূমি। ভারতীয় ট্যাঙ্কের চলাচলের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। কিন্তু অন্য সব সুবিধাই ভারতীয়দের রয়েছে। ১৩৫০ মাইল-দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে যে-কোনো ভারতীয় অনুপ্রবেশ-প্রচেষ্টা রোধ করার চেষ্টায় পাকিস্তানিরা অতিরিক্ত ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের অবস্থান হালকা করে ফেলেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যসংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ হাজার। ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা এর দ্বিগুণ। পাকিস্তানিদের জঙ্গি বিমান রয়েছে

মাত্র ২৩টি—পুরনো এফ–৮৬ স্যাবর জেট। ভারতীয়দের বিমানের সংখ্যা বেশি, এবং সেগুলো নতুন ও উন্নততর। যুদ্ধের দু'দিন না যেতেই দুই–তিনটি বাদে সবগুলো স্যাবর জেটই বাংলার আকাশ থেকে ভূপাতিত করা হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে প্রত্যয়দীপ্ত যুদ্ধ–বিবরণী প্রদানের পর গত শুক্রবার পাকিস্তানের সামরিক মুখপাত্র স্বীকার করেছেন যে, 'অতিপরিশ্রান্ত' পাকিস্তানি সৈন্যদের কোনো বিমান সমর্থন নেই।

তবে এই যুদ্ধে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পাকিস্তানি সৈনিকের বিচ্ছিন্নতা। জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঘৃণার পাত্র সে, কেননা আট মাস আগে তাকে হত্যা ও বর্বরতার অবাধ অধিকার দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এখানে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগোষ্ঠীকে অবদমিত ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করা যায়।

কিন্তু পাকিস্তানিদের কল্পনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল বাঙালিদের রুখে দাঁড়াবার শক্তি। এবং এখন পাকিস্তানিদের দশা হয়েছে বৈরী সাগরে মাছের মতো। যখনই সে পিছিয়ে যাচ্ছে সবসময়েই শঙ্কা বহন করছে কোথাও থেকে কোনো বাঙালি গেরিলা হয়তো ঝাঁপ দিয়ে পড়বে তার ওপর। হাতের আঙুল কেটে ফেলে ধীরে ধীরে দেখবে তার মৃত্যু।

ভারতীয় অগ্রাভিযানের মুখে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য চেষ্টা করছে উর্দি ছেড়ে সাধারণ পোশাকে গ্রামাঞ্চলে মিলিয়ে যেতে। কিন্তু এটা এক ব্যর্থ প্রয়াস। বাঙালিদের ভূমিতে একজন পাকিস্তানির লুকোবার কোনো উপায় নেই। এই দেশের মানুষের চেয়ে সে দীর্ঘাঙ্গ, শক্তসমর্থ আর ফর্সা। বাংলা ভাষা সে রপ্ত করলেও উচ্চারণভঙ্গিতে ধরা পড়ে যাবে অবধারিতভাবে। আর যদি উর্দু অথবা পশ্‌তু ভাষা ছাড়া অন্য কিছু তার জানা না থাকে তবে তো আত্মসমর্পণই একমাত্র ভরসা।

এটা সত্য যে ভারতীয়রা সবসময়েই পাকিস্তানিদের বে–রাস্তা দিয়ে আক্রমণে কাবু করেছে। বড় রাস্তায় বাঙ্কার ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানিদের গড়া শক্ত বাধা ভারতীয়রা পাশ কাটিয়ে গেছে ছোট রাস্তা ও দেশীয় সড়ক দিয়ে। এবং কোনো বিদেশভূমিতে যুদ্ধ পরিচালনাকালে সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানীয় গোয়েন্দা–সহায়তা পাচ্ছে ভারতীয়রা।

এটাও সত্যি যে পাকিস্তানিরা যশোরের মতো এমন সব জায়গা থেকে পিছিয়ে এসেছে যেখানে তাদের ছিল সুবিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং তাদের অবস্থানচ্যুত করতে ভারতীয়দের আরো কঠিন ও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হতো। এবং পাকিস্তানিরা পিছিয়ে আসছে এমন ভাব নিয়ে যেন যত পেছনে ততই নিরাপদ।

এতসব সত্ত্বেও যখনই পাকিস্তানিরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, ইউনিটের বাকি অংশকে রক্ষা করার জন্যই হোক অথবা একেবারে উপায়হীন হয়েই হোক তখন তারা লড়াই করেছে ভয়ঙ্কর, প্রায় ভূতগ্রস্তের মতো—এবং ভারতীয়রা যতটা না স্বীকার করতে প্রস্তুত তাঁদের হতাহত হয়েছে তার চাইতেও বেশি।

তবে এখন ভারতীয় সৈন্যরা ক্রমেই আরো এগিয়ে আসছে। ঢাকার ৩০,০০০ সৈন্যের চারপাশের ফাঁস প্রায় গুটিয়ে আনছে ও এমনিভাবে দেশের বিভিন্ন পকেটে পাকিস্তানিদের অবস্থান বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। পালাবার সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেখানে

পাকিস্তানিরা নদীবন্দরে পিছিয়ে এসেছে ভারতীয়রা বন্দর দিয়ে বের হবার উপায় নষ্ট করে দিয়েছে—যে কোনো নৌযান বের হবার উপক্রম করতেই ভূমি ও আকাশ থেকে আক্রমণ করে তা বানচাল করা হচ্ছে।

পাকিস্তানিদের প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছে ভারতীয়রা কিন্তু পাকিস্তানি জেনারেলদের মুসলিম জেহাদি মনোভাব সুপরিচিত এবং এমনটা খুবই সম্ভব যে শেষ মানুষটি ও শেষ কার্তুজটি পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার হুকুম তারা দেবে—পাগলামি বটে, তবে অসম্ভব কিছু নয়।

একটি রক্তস্নান ঘটবে, একটি ডানকার্ক্, তবে এমনিভাবে কোনো জাতির জন্ম এটাই তো প্রথম নয়।

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
ডিসেম্বর ১১, ১৯৭১

উদ্ধারকারী বিমান অবতরণে অসম্মতি

অবরুদ্ধ ঢাকায় আজ বৃটিশ ও কানাডীয় বিমান অবতরণের অনুমতি দেয় নি পাকিস্তান সরকার, ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় সম্ভাব্য জিম্মি হিসেবে আটকে পড়েছে ৫০০ বিদেশী। উদ্ধারকারী বিমান অবতরণে পাকিস্তানের এই অসম্মতি ব্যক্ত হয়েছে যখন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভারগ্রহণের চূড়ান্ত অভিযান হিসেবে ঢাকার দিকে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় বাহিনী।

বিমানযোগে উদ্ধারকর্ম চালানোর জন্য জাতিসংঘ আনীত চারটি সি–১৩০ পরিবহন বিমান রয়েছে কলকাতায় এবং কানাডীয় বিমান বাহিনীভুক্ত এর একটি বিমান যখন ঢাকার ৩০ মিনিট দূরবর্তী আকাশসীমায় পৌঁছে অবতরণের অনুমতি প্রার্থনা করে তখন কনট্রোল টাওয়ার থেকে বিমানটিকে ফিরে যেতে বলা হয়। পাইলটের বক্তব্য অনুসারে কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বলা হয় : 'জাতিসংঘ পরিচালিত কি অপরিচালিত আমরা তার থোরাই পরোয়া করি। ভারতের মাটি থেকে কোনো বিমানকে এখানে আসতে দেওয়া হবে না।' কলকাতায় ফিরে আসে এই প্লেন।

এখানকার একজন বিদেশী কূটনীতিকের কাছ থেকে জানা যায় এর অল্পকাল পরে কলকাতায় খবর এসে পৌঁছয় যাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পাকিস্তানিরা তাদের অবস্থান কিছুটা নমনীয় করেছে। আরেকটি পরিবহন বিমান, বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর হারকিউলিস, ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অপর তিনটি বিমান এগিয়ে রানওয়ের প্রান্তে গিয়ে ওড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পর বৃটিশ বিমানটি ফিরে এসে অবতরণ করে এবং অন্য বিমানগুলোও হ্যাঙ্গারে ফিরে যায়। জানা যায় বৃটিশ বিমান

থেকে ঢাকার কনট্রোল টাওয়ারে বার্তা পাঠালে এর আগে কানাডীয় বিমানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল সেই একই জবাব মেলে।

ভারত বারবারই বলেছে যে, ১২৫ জন আমেরিকান ও অপরাপর দেশের ৪০০ বিদেশী নাগরিককে উদ্ধারকারী সকল বিমানকে অবশ্যই যেতে-আসতে কলকাতায় অবতরণ করতে হবে। ভারতীয়দের মতে কেবল এভাবেই তারা বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে। তবে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মতে আসল কারণ হলো ভারত এটা নিশ্চিত করতে চায় যে কোনো পাকিস্তানি অফিসার যেনো বিমানে পালাতে না পারে।

ভারতীয় শর্ত গৃহীত

জাতিসংঘ কিংবা পাকিস্তান কেউই ভারতের এই শর্ত পছন্দ করে নি। তা সত্ত্বেও, গতরাতের কূটনীতিক সূত্রের খবরে প্রকাশ, উভয়েই এটা মেনে নেয় এবং বিমানযোগে উদ্ধারকর্মের প্রস্তুতি শুরু হয়।

কূটনীতিক সূত্রে প্রকাশ, পাকিস্তান এখন অভিযোগ করছে যে, উদ্ধার কাজে জন্য সম্মত আকাশযুদ্ধ-বিরতি, যার আওতায় বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখবে, সেই সুযোগ নিয়ে ভারত হেলিকপ্টার ও প্লেনে করে ঢাকার আশপাশে ছত্রী ও পদাতিক সৈনিকদের নামিয়ে দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করছে।

আজ নিয়ে তিনবার বিমানযোগে উদ্ধার প্রচেষ্টা বানচাল হলো। প্রথমবারটি ঘটেছিলো গত বুধবারে যখন একটি কানাডীয় প্লেন ঢাকায় নেমে ভারতীয় বিমান হামলার কবলে পড়ে। অথচ তখন আকাশ-যুদ্ধে বিরতি বজায় থাকার কথা ছিল। ভারতীয়রা পরে জানায় এটা ভুলক্রমে ঘটেছে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয়টি ঘটে পরের দিন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক থেকে উড়ে আসার সময় বঙ্গোপসাগরের ওপর এই একই পরিবহন বিমানের ক্ষেত্রে। জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলায় বিমানে ফুটো হয়ে যায়। পাইলট আবার ব্যাংকক ফিরে যেতে সমর্থ হন।

বাংলাদেশের পক্ষে র‍্যালি

পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতাড়িত করে ভারতীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠিত এক মুক্তাঞ্চলে বিদ্রোহী বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা আজ প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে আবির্ভূত হন।

বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ চারটি বাস-বোঝাই ১২৮ জন বিদেশী সংবাদদাতাসহকারে ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর প্রহরায় মোটরগাড়িবহর নিয়ে যশোর উপস্থিত হন।

যশোরের পথে রাস্তার একস্থানে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে ডান হাত বুকের ওপর রেখে জনাব নজরুল ইসলাম বললেন, 'আমি আজ সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমি চলেছি আমার মুক্ত মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে।'

গত মঙ্গলবার ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত যশোর শহরে জনতার উদ্দেশে অস্থায়ী

রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কেউ সম্পর্ক বিনষ্টের চেষ্টা করলে সেটা আমরা সহ্য করবো না।'

তিনি আরো বলেন, 'এখন থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটলো, আর স্থান হবে না ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের।' উপস্থিত জনতা ছিল সংযত, অল্পোৎসাহী; যে স্পন্দিত জনতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুনতে সমবেত হতো তার অনুজ্জ্বল সংস্করণ এই জনতা। পূর্ব পাকিস্তানের এই নেতা মার্চ মাস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী, যখন থেকে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন দমাতে পাকিস্তানি সেনাভিযান শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানিদের কবল থেকে যশোর মুক্ত হয়েছে মাত্র চারদিন, ইতিমধ্যেই মানুষ প্রায় প্রতিটি ভবনের দেয়ালে মুজিবের পোস্টার সেঁটে দিয়েছে। দেদার বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা।

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে নারী ও শিশুসহ প্রায় ১২০০ অবাঙালিকে আটক করে রাখা হয়েছে তাদের নিরাপত্তার কারণে। সেনাবাহিনীর পক্ষ–নেয়া এই অবাঙালিদের বেশিরভাগই বিহারি।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র (ভারতীয়) সৈন্যদের থাকার আর প্রয়োজন হবে না।'

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
ডিসেম্বর ১২, ১৯৭১

পশ্চিম পাকিস্তানের সমর্থকরা শহরে ঢুকছে

বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগের ওপর আরোপিত বাধা পাকিস্তান আজ শিথিল করেছে এবং ভারতে এসে পৌঁছনো উদ্ধারকৃতরা জানাচ্ছেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যতই এগিয়ে আসছে বাঙালিরা দলে দলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাঁরা আরো জানান, বাঙালিদের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি সাড়ে আট মাসব্যাপী বাঙালি-পীড়নে পাকবাহিনীর সহযোগী বিহারি ও অন্যান্য অবাঙালি শহরে এসে ঢুকছে, তাদের সঙ্গে রয়েছে আর্মির দেয়া অস্ত্র।

যে ৪২০ জন উদ্ধারকৃত বিদেশী আজ কলকাতা এসেছেন তাঁদের একজন বললেন, 'শেষ মুহূর্তে যে-সব কথাবার্তা পাকিস্তানিরা বলছে তাতে যদি সিরিয়াস হয় তবে তারা শহর দগ্ধ করে ফেলবে তবু আত্মসমর্পণ করবে না।'

নয়দিন আগে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারতীয় বিমানের 'প্রায় বিরামহীন' হামলার বর্ণনাও দিয়েছেন উদ্ধারকৃতরা। তাঁরা তুলে ধরেছেন আরো চিত্র, গতকাল থেকে জারিকৃত সার্বক্ষণিক কারফিউ, নিষ্প্রদীপ রাতে কোনো জানালায় আলো দেখা গেলে সেনাবাহিনী প্রশিক্ষিত হোমগার্ডদের গুলিবর্ষণ, গতকাল অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে ঘটানো বিস্ফোরণ এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রায় আটক অবস্থায় থাকা বিদেশী সাংবাদিকদের রিপোর্টিং ও চলাচলের ওপর আরোপিত ক্রমশ-কঠোর-হয়ে-ওঠা বিধিনিষেধ।

আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ

আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষভাবে বৃটেনের পক্ষ থেকে কঠোর চাপ প্রয়োগের পরই

গতরাতে পাকিস্তান তিনটি বৃটিশ সি–১৩০ পরিবহন বিমানের অবতরণ–সুযোগ দিতে স্বীকৃত হয় এবং আজ স্নায়ুচাপ–পীড়িত বিদেশীদের ঢাকা থেকে নিয়ে আসা হয়।

ইতিপূর্বে প্রদত্ত পাকিস্তানের সম্মতি সত্ত্বেও গতকাল বিমান যোগে উদ্ধার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় যখন কলকাতা থেকে আগত প্রথম বিমানকে ঢাকার কনট্রোল টাওয়ার ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

গত সপ্তাহে কানাডীয় বিমানের নেওয়া দু'টি উদ্ধার–প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় যখন ঢাকার আকাশপথে বিমানটি গোলাগুলির মুখে পড়ে।

এখানকার অনেক কূটনীতিক মনে করেছিলেন যে, কোনো নিষিদ্ধ সামরিক বস্তু বিমান বহন করছে না অথবা কোনো উর্ধ্বতন পাকিস্তানি কর্মকর্তা গোপনে পালিয়ে যাচ্ছে না এটা নিশ্চিত করতে কলকাতা থেকে এবং কলকাতা হয়ে বিমানযোগে পরিচালিতব্য উদ্ধার পরিকল্পনা পাকিস্তান গতকাল বাধাগ্রস্ত করেছে, কেননা তারা বিদেশীদের সম্ভাব্য জিম্মি হিসেবে রাখতে চায়, সম্ভবত এর দ্বারা ঢাকা আক্রমণ থেকে ভারতীয়দের বিরত করা যাবে।

পাকিস্তানের ওপর চাপ

তবে গত রাতে, খবরে প্রকাশ, বৃটিশ ও অন্যরা পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করে যে তারা (পাকিস্তানিরা) যদি এমত ভাবনা করে থাকে তবে আগামী দিনগুলোতে কূটনীতিক ও অন্য কোনোরকম সহায়তাই আর পাবে না।

যে ৪২০ জন বিদেশী আজ ঢাকা থেকে বিমানে এসেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ১৮০ জন বৃটিশ ও ১২০ জন আমেরিকান এবং অন্যরা বিভিন্ন দেশের নাগরিক।

এঁদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসারত বেসামরিক নাগরিক। ঢাকাস্থ বিভিন্ন কনসুলেটের স্রেফ কাঠামোটুকু বহাল রাখতে যে গুটিকয় কূটনীতিক ব্যক্তি রয়েছেন তাঁরা ঢাকাতেই অবস্থান করছেন। আমেরিকান কনসুলেটের কূটনীতিক ব্যক্তিবর্গ রয়ে গেছেন, তবে মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহায্য এজেন্সি ইউএস এইড–এর কতক কর্মকর্তা চলে গেছেন। আট মাস আগে ক্র্যাকডাউনের পরপর চলে গেছেন দূতাবাস কর্মকর্তাদের স্ত্রীপুত্রপরিজন।

বেলা দুটোয় ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষ স্বীকৃত সাময়িক আকাশযুদ্ধ–বিরতি সমাপনের আগে রাজকীয় বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমান ঢাকায় চারবার আসা–যাওয়া করতে পেরেছিল। এই চারটি ফ্লাইটে দেশত্যাগে ইচ্ছুক সবাইকে নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। রয়ে গেছেন প্রায় পঁচিশ ব্যক্তি, এঁরা সবাই অবিবাহিত।

উদ্ধারকৃতদের প্রায় সবাই, কলকাতায় তল্লাশি অবতরণের পর, চলে গেছেন সিঙ্গাপুর, বিমানবহরের মূল ঘাঁটি যেখানে। অন্যরা সাময়িকভাবে কলকাতায় রয়ে গেছেন।

আক্রান্ত অনাথ আশ্রম

সরকারি পদাধিকার অথবা ব্যবসায়িক কারণে উদ্ধারকৃত সকলের নাম–পরিচয় গোপন

রাখতে বলা হয়েছে। তাঁদের একজন বললেন যে, ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানক্ষেত্রে পাকিস্তানি আক্রমণের পর থেকে ঢাকা বিমানবন্দর, ক্যান্টনমেন্ট ও আশপাশের এলাকায় ভারতীয় জঙ্গিবিমান বিরামহীনভাবে আঘাত হেনে চলেছে। ঢাকার দশ মাইল দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জে বিমান আক্রমণে কয়েকটি তেলের ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয়েছে।

তাঁরা আরো জানান যে, নৈশকালীন আক্রমণ, যা সাধারণত রাত দুটো থেকে শুরু হয়ে চলতো ঘণ্টা আড়াই, ছিল সবচেয়ে ভয়ের, কেননা এসব ছিল 'বেশ খামখেয়ালিপূর্ণ'।

উদ্ধারকৃতরা জানান, কয়েক রাত আগে আক্রান্ত হয়েছিল একটি অনাথ আশ্রম। কোনো কোনো খবর থেকে জানা যায় এখানে মৃতের সংখ্যা শতাধিক।

তাঁরা আরো জানান যে, সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি বলবৎ কারফিউ গতকাল ২৪ ঘণ্টার জন্য চালু হয়েছে।

তারা বলেন, এই চব্বিশ ঘণ্টার কারফিউ নিয়ে অনেক ধরনের গুজব রয়েছে। একটি মত হলো বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের পাকিস্তানি বাহিনী পাকড়াও করতে চায় এবং কারফিউর কারণে লোকজন ঘরে থাকবে বলে কাজটি সহজতর হবে।

আরেকটি মত হলো বাঙালিদের মধ্যে সৃষ্ট আতঙ্ক ও শহর-ত্যাগ-প্রবণতা হ্রাস করতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাঙালিদের ভয়ে অস্ত্র-নিয়ে-চলা অবাঙালিদের শহরে আগমনের তোড় তাদের ও বাঙালিদের ভেতরকার বহু বছরের বৈরিতার চরম পরিণতিকে প্রকাশ করছে।

বাঙালিদের দ্বারা ঘৃণিত

এটা অনুমান করা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন লোকের মধ্যে সম্ভবত ২ মিলিয়ন হচ্ছে অবাঙালি। এরা মূলত ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যা রাজ্য থেকে আগত মুসলমান, ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর যারা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল। সাধারণভাবে তাদের সবাইকেই বলা হয় বিহারি এবং তারা সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের সত্তা-পরিচয় মিলিয়ে দেখেছে ও বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবজ্ঞাভাবেরও অংশী হয়েছে।

শুধু যে একারণেই বাঙালিরা তাদের দেখতে পারে না, তা নয়, আরো কারণ হলো, বিহারিরা হচ্ছে বেনিয়ার জাত এবং বাঙালিদের চাইতে অধিকতর সচ্ছল। গত মার্চে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন ক্র্যাকডাউন শুরু করে, পীড়ন ও হত্যাকাণ্ডে তাদের সাথে হাত মেলায় বিহারিরা।

অধিকাংশ পর্যবেক্ষক মনে করেন বাঙালিরা এখন বিহারিদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। এ-কারণেই বিহারিরা দলে দলে আসছে ঢাকায়, সেনাবাহিনীর শেষ শক্ত ঘাঁটিতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

বেশির ভাগ কূটনীতিক মনে করেন যে, এখন পূর্ব পাকিস্তানে রক্তস্নান এড়াবার একমাত্র পথ হলো ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং তাদের সৈন্যদের

নিরাপদে ভারতে পৌঁছুবার নিশ্চয়তা পাওয়ার চেষ্টা করা। সেইসঙ্গে বিহারিদের জন্য কোনো ধরনের রক্ষা–ব্যবস্থা অথবা নিরাপদে পাড়ি দেওয়ার নিশ্চয়তা আদায় করা।

কিন্তু নিজেদের ইমেজ উন্নত করতে কোনো প্রচেষ্টা বিহারিরা নিচ্ছে না। উদ্ধারকৃতরা জানিয়েছেন যে, বিহারি অনিয়মিত সৈন্যরা নিষ্প্রদীপের সময় ঢাকার রাস্তায় টহল দেয় এবং কোনো বাড়ির জানালার ফাঁক গলিয়ে সামান্য আলো বের হয়ে এলে যথেচ্ছ গুলি চালায়।

একজন উদ্ধারকৃত বললেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা যখন এগিয়ে আসছে সেই সময়েও, মাত্র কয়েকদিন আগে, পাকিস্তানি সৈন্যরা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে গ্রাম এবং হত্যা করেছে কতক এলাকার অধিবাসীদের।

উদ্ধারপ্রাপ্তদের একজন জানালেন গতকাল ঢাকায় সঙ্ঘটিত এক ঘটনার কথা, স্টেনগান হাতে এক ব্যক্তি ইউসিস (মার্কিন তথ্য কেন্দ্র) ভবনে ঢুকে সবাইকে সরে যেতে বলে। তাঁরা সে আদশ পালন করলে লোকটি একটি বোমা বসিয়ে কেটে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গোটা রাস্তা ধ্বংসাবশেষে ভরে যায়। কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভবনটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে ওঠে।

ডেটলাইন : ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১

ঢাকা অভিযানের শেষ পর্ব—এক টেবিলে দু'জন মানুষ

পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বাহিনীর অভিযান শুরুর তেরো দিন পর আজ ঢাকার কেন্দ্রস্থলে রেসকোর্স নামে পরিচিত ঘাসে-ছাওয়া ময়দানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। ৭ মার্চ এই রেসকোর্স ময়দানেই সমবেত হাজার হাজার বাঙালি-জনের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিব আহ্বান জানিয়েছিলেন সামরিক আইনের অবসান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের, স্বায়ত্তশাসনকামী যে দলটি নির্বাচনে অর্জন করেছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

আজ আর কোনো ভাষণ ছিল না—ঘাসের ওপর পাতা একটি টেবিলের সামনে বসেছিলেন কেবল দু'জন মানুষ—লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে.এস. অরোরা এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি, পূর্ব পাকিস্তানে ৭০,০০০ পাকিস্তানি সৈন্যের কম্যান্ডার, যিনি স্বাক্ষর দিলেন পাকিস্তানি আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক দলিলপত্রে।

ভারতীয় অভিযানের শেষ প্রহরগুলো, রেসকোর্সের আনুষ্ঠানিকতায় যার পরিণতি, কেটেছিল মেশিনগান ও ভারি কামানের পালানুক্রমিক অগ্নিউদ্গারণে যখন ঢাকার ঠিক বাইরে লক্ষ্যা নদীর পারে দুই দলের মধ্যে চলছিল লড়াই।

ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে ঢাকা প্রবেশ করতে পেরেছে মাত্র সাতজন পশ্চিমা সাংবাদিক এবং তাঁদের মধ্যে বর্তমান সংবাদদাতাও একজন।

পাকিস্তানিদের দিকে তাক করে ভারতীয় বাহিনী যখন গোলা নিক্ষেপ করছিল তখন গ্রামবাসীরা দল বেঁধে চুপিসারে বসে তা দেখছিল। আজ সকালে ঢাকা থেকে নয় মাইল দূরে বরপা গ্রামের ধানের খেতে এমনি

দৃশ্যেরই অবতারণা ঘটেছিল। এখানে ছয়টি ৭৫ মি.মি. মাউন্টেন গানের ব্যাটারি নদীর অপর পারে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ করছিল।

প্রায় একশত গজ দূরে বসে শতাধিক লোক এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গর্জমান কামানের গোলা নিক্ষেপ দেখছিল।

অগ্রবর্তী পরিদর্শকের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে কম্যান্ড পোস্টের একজন অফিসার চিৎকার করে উঠলেন, 'চমৎকার শুটিং হয়েছে। কিছু গাড়ির ওপর আমরা আঘাত হানতে পেরেছি।'

যুদ্ধবিরতি, তবে

তখন সময় ছিল বেলা দশটা। একটি যুদ্ধ–বিরতি কার্যকর হয়েছে তবে ভারতীয় অফিসাররা বলছেন সেটা কেবল ঢাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাদের বাহিনী ঢাকা পর্যন্ত কামান দাগায় নি। ঢাকার কিছুটা আগের অবস্থান তাঁদের লক্ষ্য। তাছাড়া উত্তর–পূর্ব দিক থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসরমান এই ব্রিগেডের কেউ পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে কোনো কিছু জানে না।

বিপরীত দিকের পাকিস্তানি পক্ষও অন্ধকারে রয়েছে। কেননা এর অল্পকাল পরেই ঢাকার রাস্তায় আরেকটু এগিয়ে যে অবস্থান, সেখানে শুরু হলো ট্যাঙ্ক, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই।

এর আগের লড়াইয়ে ছিনিয়ে নেওয়া দু'টি হালকা পাকিস্তানি ট্যাঙ্ককে ভারতীয় বাহিনী মোতায়েন করলো সুবিধাজনক অবস্থানে, একটি আমবাগিচায় এবং অপরটিকে বাঁধের ধারে ১০০ গজ বামদিকে।

এবার আশপাশের সবার কানের পর্দা ফাটিয়ে গর্জন করে উঠলো ট্যাঙ্ক। নদীর ওপারে দূরে যেখানটায় পাকবাহিনী অবস্থান নিয়ে ভারতীয়দের অগ্রগতি ব্যাহত করছিল তার সংলগ্ন কারখানা এলাকা আরো চরমভাবে বিধ্বস্ত হলো এই গোলাবর্ষণে। ফ্যাক্টরি ভবন থেকে উঠতে লাগলো কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া।

পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতি

বিশ মিনিট ধরে গোটা এলাকা গোলায় দুরমুজ করার পর শুরু হলো ট্যাঙ্কের মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। ভবনের সামনে যেখানে বাঙ্কার করে পাকিস্তানিরা ছিল, প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল তা।

তখন বাঁধের নিচ দিয়ে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর একটি কলাম এগোতে শুরু করলো। তাঁরা ডানদিকে মোড় নিয়ে একটি জলার ওপর দিয়ে এগোতে লাগলো নদীর দিকে।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ঝলমলে রোদে পদাতিক বাহিনীর তৎপরতা দেখানোর জন্য সাংবাদিক দলটিকে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় ইউনিট। পাকিস্তানিদের অবস্থান থেকে এখন আর পাল্টা গুলির কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বাঁধ বেয়ে

ওপরের রাস্তায় উঠলাম এবং নীল আকাশের পটভূমিকায় নিজেদের শরীরের ছায়া-পরিলেখ অঙ্কন করলাম। আস্থার সঙ্গে আমরা হাঁটছিলাম সামনের দিকে। প্রায় মিনিটখানেক হবে।

হঠাৎ গর্জে উঠলো একটি পাকিস্তানি মেশিনগান এবং পাশ দিয়ে হিসহিসিয়ে ছুটে গেল বুলেট। আমরা যে যেভাবে পারি বাঁধের বিপরীত দিকে ঝাঁপ দেই এবং গড়গড়িয়ে পড়ার সময় উড়িয়ে দেই ধুলো ও কাঁকর। ভারতীয় মেজর আমাদের আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, গুলি আমাদের ১০-১৫ গজ দূর দিয়ে ছুটে গেছে।

পাকিস্তানিদের অব্যাহত গোলাগুলির ভেতর আমরা সাবধানে বাঁধের আড়াল ধরে এগোতে থাকি। কালভার্টের ওপর ছুটে বেড়ানো একটি বাচ্চা ছাগলের গায়ে এসে লাগে তাদের গুলি। একেবারে গুটিয়ে গেল ছাগশিশুটি। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা একটি ভারতীয় প্লাটুনের কাছে পৌঁছুই। এরা বাঁধের ওপর শুয়ে পাকিস্তানিদের দিকে তাক করে রেখেছে রাইফেল ও মেশিনগান। পাকিস্তানিরা আমাদের পরিবর্তে এবার এঁদের উদ্দেশে গুলিবর্ষণ শুরু করলো।

ভারতীয়রাও গুলিবর্ষণের জবাব দিতে লাগলো। অবিরাম এই গোলাগুলির মধ্যে আমাদের সঙ্গের এক মেজর ফিল্ড রেডিওর বার্তা শুনতে পেলেন যে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছে। বিপরীত দিকের পাকিস্তানিদের নিঃসন্দেহে এ-সম্পর্কে অবহিত করা হয় নি। হেডকোয়ার্টারের সাথে কতক পাকিস্তানি ইউনিটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

ওড়ানো হলো বড় আকারের রুমাল

তখন সময় ১২-৪০ মিনিট। পাকিস্তানিরা প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ ভারতীয়দের নিজ অবস্থানে অনড় করে রেখেছে। তারপর প্রায় ১-৪৫ মিনিটে একজন পাকিস্তানি সৈনিক, সম্ভবত অফিসার, বিপরীত তীরের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে ওড়াতে লাগলেন বড় এক রুমাল।

ভারতীয় মেজর এস. এস. ধিলন বাঁধের ওপর উঠে নদীর তীরে নামলেন। একটি দেয়ালের আড়াল নিয়ে তিনি চিৎকার করে পাকিস্তানিদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করার জন্য বললেন।

'তোমার বের হচ্ছো কি হচ্ছো না বলো,' চিৎকার করে উঠলেন মেজর। 'আমি চাই তোমরা বের হয়ে এসো। এক মিনিট সময় দিলাম, এরপর আমার ধৈর্য থাকবে না। আমি চাই তোমরা বের হয়ে এসো। তোমার লোকদের জড়ো করো এবং সামনে এগিয়ে এসে নদী পার হবার ব্যবস্থা নাও। তোমার ঐ বেজন্মা স্টেনগান মাটিতে ফেলে দাও। কামানের গোলায় তোমাদের ছিন্নভিন্ন করে দিতে বাধ্য করো না আমাকে। আমি আবারো বলছি, বের হয়ে এসো, বের হয়ে এসো।'

মেজরের পিছু পিছু সাংবাদিকরাও এগিয়ে এসেছিলেন দেয়ালের কাছে। কিন্তু তাঁরা যেখানটায় গুটিসুটি মেরে ছিল সেখান থেকে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। মেজর সদাশয়তার পরিচয় দিয়ে অবস্থা বর্ণনা করছিলেন, 'ওখানে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে আছে আরো চারজন লোক। সে শাদা রুমাল নাড়াচ্ছে। এবার ওরা আত্মসমর্পণ করছে।

সব মিলিয়ে ১০ জন।'

বাদবাকি পাকিস্তানি, সংখ্যা তাদের যাই হোক, স্পষ্টতই পালিয়েছে।

এই দৃশ্য—যা সম্ভবত পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধের শেষ লড়াই—সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিল ২০ মিনিট। এই সময় পাশের এক অগভীর পদ্মপুকুরের ধারে বসে গোঙাচ্ছিল যন্ত্রণাকাতর আহত দুই ভারতীয় সৈনিক। মেজর যখন আত্মসমর্পণকারী প্লাটুনকে জড়ো করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন রাস্তায় ধুলোর ওড়াউড়ি দেখে ইঙ্গিত পাওয়া গেল ব্রিগেড হঠাৎ করে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে।

প্রতিটি মুখে আনন্দের ছোঁয়া

দূরে পিস্তল-বন্দুকের গুলির আওয়াজ পাওয়া গেলেও গুরুতর প্রতিরোধের কার্যত অবসান ঘটেছে। ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর কলাম—প্রতিটি সৈনিকের চোখে-মুখে আনন্দের ছোঁয়া— এগিয়ে যাচ্ছিল প্রাদেশিক রাজধানীর দিকে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে ট্যাঙ্কগুলো পাকিস্তানিদের দফারফা করছিল তারই একটিতে সওয়ারী হয়ে এগোলেন বর্তমান সংবাদদাতা।

রাস্তা ভরে আছে ঢাকাগামী সৈন্য ও বাঙালিতে, তাঁদের অবলম্বন ট্যাঙ্ক, ট্রাক, স্কুটার, সাইকেল, রিক্শা এবং স্রেফ পদযুগল। যে যেভাবে পারছে সওয়ারী হচ্ছে মুক্ত রাজধানীর উদ্দেশে। একটি সামরিক বহরের চাইতে দৃশ্যটা বরং অনেকখানি সার্কাসের প্যারেডের মতো।

সৈন্যদের যাত্রাপথের সবখানেই বাচ্চাদের কোলে নিয়ে তুলে ধরছে পিতা, তাদের হাত ধরে নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে ভারতীয় সৈন্যদের। শীতলক্ষ্যা নদীর পারে এসে জলচর ট্যাঙ্কটির নদী পাড়ি দেয়ার জন্য যাত্রী কিছু ঝেড়ে ফেলতে হলো। আমি একটি দেশী নৌকো নিয়ে নদী পার হই। অপর পাড়ে এসে আরো কতক অফিসার, সৈনিক, সাংবাদিক মিলে সওয়ার হই জিপে, জিপের চালক ব্রিগেড কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার আর.এন. মিশ্র।

যুদ্ধের কিছু ক্ষত

পুরু মোচের কম্যান্ডার ঢাকার পথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে, সামনের বনেটের ওপর বসা যাত্রীদের গাদাগাদি ভিড়ের ফাঁক দিয়ে কোনোক্রমে রাস্তা দেখে নিতে চেষ্টা করছিলেন। আমরা যে গ্রাম এলাকার মধ্য দিয়ে চলছিলাম সেখানে যুদ্ধের বিশেষ ধ্বংসচিহ্ন নেই। সবখানেই প্রায় একই দৃশ্য। রাস্তার মাঝেমধ্যে পড়ে আছে অগ্নিদগ্ধ যান, কামান অথবা মর্টারের গোলায় বিস্ফোরিত, আরো দেখা যায় বোমায় বিধ্বস্ত পাকিস্তানি বাঙ্কার। আর যেসব জায়গায় পাকিস্তানিরা প্রতিরোধ দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে দেখা যাবে কালচিটে অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন ও কুঁড়েঘর।

পশ্চাদপসরণকালে যেসব সড়ক ও রেলসেতু পাকিস্তানিরা ধ্বংস করেছে তাছাড়া গোটা অঞ্চল মোটামুটিভাবে বড়রকম ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কোথাও কোথাও এমনকি দেখা যায় ধানখেতের পাশের নালায় মাছের উদ্দেশে ঝাঁপ দিচ্ছে মাছরাঙা পাখি।

কাছেকার কলাবাগানে সবুজ নারকেল বীথির নিচে চরে বেড়াচ্ছে গরু। বস্তুত অনেকসময় এটা বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে যে এই দেশকে স্পর্শ করেছে একটা যুদ্ধ—সেকথা জানান দিচ্ছে কেবল মৃতদের নীরবতা এবং নিরুদ্দিষ্টরা, আর কখনোই যারা ফিরে আসবে না।

তা সত্ত্বেও যুদ্ধের এক সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান—রাস্তার ধারে পাকিস্তানি সৈন্যরা, যারা অপেক্ষা করছে আত্মসমর্পণের । তাদের অস্ত্র গ্রহণ কিংবা আত্মসমর্পণ এলাকায় একত্র করার মতো সময় পাওয়া যায় নি এবং অস্ত্রসহই তারা রয়েছে রাস্তার ধারে। ২৫ মার্চ ও তার পর স্বায়ত্তশাসনকামী বাঙালিদের আন্দোলন দমন করতে নিরস্ত্র সাধারণজনের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন যেসব পথচারী, তাঁদের জন্য এ এক রক্ত হিম-করা দৃশ্য।

পাকিস্তানিদের দেখাচ্ছে কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন এবং তাদের মনোবল নেই বলেই মনে হয়। তারা সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ালেও যে-জনগণ তাদের বুলেটের রাজত্বে এতো যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সেখান থেকে তেমন কিছু পাওয়া সুদূরপরাহত।

কম্যান্ড পোস্টের ব্যারাকের সামনে ব্রিগেডিয়ার মিশ্র তাঁর জিপ থামালেন। পাকিস্তানি অফিসারকে নির্দেশ দিলেন আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য ভারতীয় সৈন্যরা এসে পৌঁছনো অবধি তার লোকজনদের ভেতরে রাখতে। সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'কেউ রাস্তায় যাবেন না। ওখানে মুক্তিবাহিনী থাকতে পারে।'

মুক্তিবাহিনীর অনেক সদস্যই প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব। তাঁদের রাজনৈতিক টার্গেট কেবল পাকিস্তানি সৈন্যরা নয়, সেনাবাহিনী প্রশিক্ষিত রাজাকার বা হোমগার্ড এবং অবাঙালি ও অন্য আর বেসামরিক দালালরাও।

জিপে বসা এক অফিসার বললেন, 'এই ডামাডোলের মধ্যে আমরা যদি পাকিস্তানিদের রক্ষা না করি তবে মুক্তিবাহিনী তাদের কচু-কাটা করবে।'

অস্বস্তিকর সঙ্ঘাত

জিপ যখন ঢাকার দিকে এগিয়ে চলছিল হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো কয়েক শত বাঙালি, আনন্দে উদ্বেল তাঁরা সবাই, উচ্চকণ্ঠে স্বাগতিক স্লোগান দিয়ে এগিয়ে আসছিল ভারতীয় বাহিনীর দিকে।

এদিকে. ৫০ ক্যালিবর মেশিনগান বসানো একটি পাকিস্তানি জিপও এগোচ্ছিল জটলার দিকে। পাকিস্তানিরা মনে করলো জনতা বুঝি তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং মেশিনগানের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করলো কয়েক দফা। দুই ব্যক্তি পড়ে গেল মাটিতে, আহতদের ধরাধরি করে তুলে জনতা আবার মিলিয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ ব্রিগেডিয়ার মিশ্র ও ভারতীয় বাহিনী চার পাকিস্তানিকে পাকড়াও করে তাদের অস্ত্রপাতি কেড়ে নিল। সমানে গালাগাল করে চললো তাদের যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ভয়ে একেবারে মিইয়ে গেল, ভেবেছিল এখুনি বুঝি তাদের প্রাণে মারা হবে। তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো অন্যত্র প্রহরাধীনে রেখে কোর্ট মার্শাল করার জন্য।

পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বোঝাই একটি বাস দেখা গেল

ঢাকার দিকে যাচ্ছে। বাসের ছাদেও লোকজন। নারী ও শিশুরা যেভাবে পুরুষ সঙ্গীর লগ্ন হয়ে আছে, স্মরণ করিয়ে দেয় তা ভীত শরণার্থীদের চিত্র।

ভারতীয় বাহিনীর ঢাকা আক্রমণ শুরুর আগেই যেহেতু পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছে, তাই শহরের কোনো বড়রকম ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। বিমানবন্দর ও মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে বোমা বর্ষণের ক্ষতি ছাড়া তেমন আর বিশেষ কিছু ঘটে নি।

বিমানবন্দর অভিমুখী রাস্তায় এখনো বড় বড় গর্ত হয়ে আছে। রানওয়ে মেরামত করা হয়েছে। তবে একদিকে স্তূপ করা আছে একদা যা ছিল জঙ্গি বিমান, তার ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপ। টারমিনাল ভবনের জানালার সব কাচ বিমান হামলায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

বহু বাড়িঘর দোকানপাট এখনো তালাবন্ধ, অপেক্ষা করছে গৃহকর্তা ও মালিকের প্রত্যাবর্তনের। এরপরও নীরবে জমে উঠছে ভিড়। যেন শূন্য থেকে উদয় হচ্ছে এঁদের। তাঁরা ঘিরে ধরছিল আমাদের গাড়ি—আনন্দধ্বনি করে 'ভাই' বলে ডাকছিল আমাদের এবং হাতে হাত মেলাচ্ছিল। স্পর্শ করতে চাইছিলো আরেকজন মানুষকে।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে দশটি ভারতীয় হেলিকপ্টারের বহর একসঙ্গে উড়ে এসে বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করে। জেনারেল অরোরা ও অপরাপর ভারতীয় অফিসারদের তারা বহন করে নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য এঁরা সবাই এসেছেন। টারমাকে অপেক্ষা করছিলেন জেনারেল নিয়াজি, কসরৎ করে আত্মসম্মানের মুখোশ এঁটে রাখছিলেন, মাথায় তার কালো টুপি, হাতে একটি ভাঁজ-করা বহনযোগ্য শিকারির আসন, যদিও এর ভাঁজ খুলে বসেন নি তিনি কখনো। তার পাশে দাঁড়িয়ে জেনারেল অরোরার চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে.এফ.আর. জ্যাকব, অল্প কিছুক্ষণ আগেও আনন্দ-উন্মত্ত বাঙালি জনতার অধীর আলিঙ্গনে অস্থির হয়ে ছিলেন তিনি।

উভয়েই স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেলেন জেনারেল অরোরার হেলিকপ্টারের দিকে। মাইক ও ক্যামেরা বেষ্টিত থাকার পর তাঁরা আত্মর্পণ-দলিল স্বাক্ষরের জন্য গাড়ি করে রেসকোর্স ময়দানের দিকে চললেন।

দলিল স্বাক্ষরের পর দুই জেনারেল উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলালেন। একটি জিপে করে ফিরে চললেন জেনারেল নিয়াজি, স্টাফ কারে জেনারেল অরোরা।

ভারতীয় সামরিক দলটি যখন ফিরে যাচ্ছিল, বিমানবন্দরে তখনো বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে তাঁরা কলকাতার উদ্দেশে ফিরতি-যাত্রা শুরু করেন। সারাদিন জুড়েই শহরে চলছিল বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ। রেডক্রস ঘোষিত নিরপেক্ষ এলাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে ঘটে বন্দুক লড়াই।

রাতে আত্মসমর্পণ-স্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে দীর্ঘ সারিতে দাঁড় করানো পাকিস্তানি সৈন্যদের দেখাচ্ছিল আগ্রহী ও আশ্বস্ত, কেননা, সেখানে বাঙালিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে ভারতীয় বাহিনী।

ডেটলাইন : কলকাতা, ভারত
ডিসেম্বর ২০, ১৯৭১

যুদ্ধ সংবাদদাতার নোটখাতা

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৫ দিন ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন সংবাদদাতার নোটখাতায় দ্রুত লিপিবদ্ধ বিবরণ নিম্নে পত্রস্থ হলো।

ডিসেম্বর ৫

ক য়েকজন সাংবাদিকের পূর্ব পাকিস্তান ঘুরে আসার একটা ব্যবস্থা করেছে সেনাবাহিনীর জনসংযোগ দপ্তর। এবড়োথেবড়ো রাস্তা দিয়ে যুদ্ধস্থল পর্যন্ত পৌছুতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। সীমান্ত থেকে তিন মাইল ভেতরে ধূলিময় ছোট্ট গ্রাম উথলিতে এসে আমরা পৌছুলাম। যুদ্ধের প্রথম রাতেই ভারত এটা দখল করে নেয়।

পাকিস্তানিদের শূন্য বাঙ্কার ও গোলাগুলির পরিত্যক্ত বাক্স ছাড়া দেখার আর কিছু নেই। হঠাৎ প্রায় একশত গজ দূরে দাঁড়ানো ভারতীয় সৈনিক আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো, 'হ্যান্ডস্ আপ!'

আমরা ভেবেছিলাম সে রসিকতা করছে, তবু যাই হোক দু'হাত ওপরে তুলি। সে স্টেনগান উঁচিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। লোকটাকে মনে হচ্ছিল মাতাল। ফটোগ্রাফারদের কেউ কেউ তার ছবি তুলতে শুরু করলে সে আরো ক্ষেপে যায়। দ্রুত সে আমাদের দিকে এগোতে থাকে। ২৫ গজের মধ্যে এসে স্টেনগানের কক টান দিলে আমাদের সফরপরিচালক মেজর চিৎকার করে ওঠেন, 'থামো, থামো!'

সৈনিকটি হাঁটু মুড়ে বসে আমাদের দিকে স্টেনগান তাক করে। আমরা চারদিকে ছিটকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মেজর চিৎকার করে সৈনিকের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ব্যারেল চেপে নামিয়ে দেয়।

সঙ্কট কেটে গেল এবং সৈনিকটিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এই অ্যাকশনের জন্য তো আমরা আসি নি।

❁ ❁ ❁

আমরা গেলাম কাছাকাছি আরেকটি মুক্ত শহর দর্শনায়। সেখানকার যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের বললেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভূপাল সিং এবং দেখালেন যুদ্ধের চিহ্ন—তাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি ক্ষত। টেলিভিশন ক্যামেরা চলতে শুরু করলে তিনি পেছন ফিরে শার্ট টেনে তুলে উবু হলেন ছোট প্লাস্টারটুকু দেখাতে। উবু হয়েই রইলেন তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না টেলিভিশন ক্রুরা জানালো তাঁর পিঠের ছবি যথেষ্ট পরিমাণেই তোলা হয়ে গেছে।

জনপরিত্যক্ত রেলস্টেশনের দপ্তরে স্টেশন মাস্টারের খাতায় শেষ যে ট্রেনের এন্ট্রি রয়েছে, তা স্টেশন ছেড়ে গেছে ২৬ মার্চ সকালে, পাকিস্তানি সন্ত্রাস-রাজ শুরুর পরপর।

এক পঙ্গু বৃদ্ধ, মোয়াজ্জেম হোসেন মিয়া, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হলেন প্ল্যাটফর্মে। তিনি জানালেন যে, নয় মাস তিনি শহরের কাছে লুকিয়ে ছিলেন, কেননা পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন আসে অন্যদের মতো তিনি দ্রুত ভারতে পালিয়ে যেতে পারেন নি।

আরো ব্রিফিং-এর জন্য আমরা কর্নেল সিং-এর হেডকোয়ার্টারে আসি। সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণ এবং তাঁদের ইতস্তত নিজেদের মতো ঘুরে বেড়ানোতে তিনি তিতি বিরক্ত। তাই আমাদের ভয় দেখিয়ে স্থান ত্যাগে প্ররোচিত করার জন্য কাছাকাছি ঘাঁটি গেড়ে বসা সৈন্যদের কয়েক রাউন্ড গোলাগুলি ছুঁড়তে বলেছিলেন। ফায়ারিং শুরু হলে ছবি তোলার জন্য টেলিভিশন ক্রুরা ছুটে গেল অবস্থানের কাছে। আমাদের সফরসঙ্গী অফিসারের উদ্দেশে কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এইসব লোককে আটকাও। তোমাকে যা বলেছি, ওঁদের ওখানে যেতে দেবে না।' অফিসারও একইরকম পরিশ্রান্ত। তিনি বললেন, 'আপনিই ওঁদের যেতে দিলেন এবং এখন আপনিই বলছেন আটকাতে !'

আমাদের চলে আসার সময় সঙ্গী অফিসারটি আপন মনেই বলছিলো, 'শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে কষ্টকর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে লড়াই।'

❁ ❁ ❁

আমরা চলছি ১৫ মাইল দূরের এক গ্রাম সুয়াদিতে, যেখানে সদ্য সমাপ্ত হয়েছে লড়াই। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছুই তখনো ইতস্তত আগুন জ্বলছিলো। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানিদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভারতীয় গোলাবর্ষণের ফলে মাটির ঘরগুলো সব মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং খড়ের চালায় আগুন জ্বলছে। বিষণ্ন গ্রামবাসীরা পুকুর থেকে জল তুলে নিয়ে আগুনের ওপর ঢালছে। আকুল হয়ে কাঁদছে এক বৃদ্ধ। কয়েক শ' গজ দূরে এক মাঠের মধ্যে তাদের বাংকারে মরে পড়ে আছে ২২ জন পাকিস্তানি সৈনিক—তাদের কেউ যেন বিশ্রামরত, অন্যদের দেহ ভয়ঙ্করভাবে দুমড়েমুচড়ে গেছে গোলা বিস্ফোরণে। ঝুরঝুরে মাটিতে ভরে গিয়ে গুহাকৃতি হয়ে উঠেছে একটি বাঙ্কার,—কবরসদৃশ বাঙ্কারের ভেতর মাটিচাপা-পড়া দেহের বুটপরা দু'জোড়া পা শুধু বেরিয়ে আছে।

রাতে আমরা যখন কলকাতায় ফিরলাম ফিরপো রেস্তোরাঁয় পার্টি হচ্ছে—'মিস ক্যালকাটা ১৯৭১-এর সঙ্গে এক সন্ধ্যা', আগের রাতে এই সুন্দরী নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

যুদ্ধ কলকাতাকে বিপর্যস্ত করেছে ওপর-ভাসাভাবে। নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা কারো কারো বিরক্তি উদ্রেক করেছে এবং বাসে সাঁটা আছে বিভিন্ন স্লোগান, যেমন গুজবে কান দেবেন না, অহেতুক ভয় পাবেন না, শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হউন। এছাড়া রবিবারের সান্ধ্যভ্রমণকারীর সংখ্যা একই রয়েছে, ঠিক যেমন রয়েছে ভিক্ষুকবাহিনীর সংখ্যা।

ডিসেম্বর ৮

যাওয়া হলো যশোরে, যেখানে জনগণ স্বাধীনতার গোটা একটা দিন প্রথমবারের মতো উপভোগ করছেন। কলকাতা থেকে জিপে করে ৮০ মাইল পথ অতিক্রমকালে গ্রামবাসীরা উল্লসিত হয়ে এগিয়ে এসেছে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। কোথাও কোনো তরুণী চোখে পড়ে না। কেননা তাঁরা হয়েছিল পাকিস্তানিদের যৌন-নৃশংসতার শিকার এবং ভারতের শরণার্থী শিবির অথবা লুকনো আশ্রয় থেকে বের হয়ে তাঁরা ফিরছে সবার শেষে।

কোনো কোনো খেতে ফসল বোনা হয় নি। কোথাও-বা অতিবৃদ্ধি ঘটেছে অকর্তিত আখের। ঝিকরগাছায় কপোতাক্ষ নদের ওপরকার সেতু ভেঙে পড়ে আছে—যশোর থেকে পশ্চাদপসরণ করার আগে পাকিস্তানিদের শেষ কীর্তি।

ছোট নৌকোয় করে আমরা নদী পার হই। এদিকে সাহায্যদানে আগ্রহী শত শত গ্রামবাসীর সহায়তায় আর্মির লোকজন পনটুন সেতু বসাবার কাজ করে চলেছে। অপর পারে নতুন সেলাই করা বাংলাদেশের পতাকা বিক্রি হচ্ছে প্রতিটি ভারতীয় পঁচাত্তর পয়সায় বা প্রায় ১০ সেন্টে। আমাদের নামবার সাথে সাথে দাম চড়ে গেল এক রুপি বা ১৩ সেন্টে। যেখানটায় লড়াই হয়েছে সেই জায়গাটি ছাড়া গ্রামাঞ্চলের আর কোথাও যুদ্ধের ক্ষত তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। যুদ্ধস্থলেও ধ্বংসস্তূপ বেশি সময় জুড়ে পড়ে থাকে নি। নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য পাকিস্তানি বাঙ্কার খাবলেখুবলে যা পাচ্ছে গ্রামবাসীরা নিয়ে নিচ্ছে—কড়িকাঠ ও করোগেট ঢেউটিন—সবকিছুই তাঁদের কাজে লাগবে। মাঝেমধ্যে পড়ে থাকা ভস্মীভূত পাকিস্তানি গাড়িগুলোরও একই দশা হয়েছে। যুদ্ধের বাদবাকি চিহ্নও ধুয়েমুছে দেবে পরবর্তী বৃষ্টির পশলা। রাস্তায় মার্চ করে অথবা সাইকেলে চেপে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের দল। তাঁদের চোখেমুখে গম্ভীর ভাব। ফ্রন্ট লাইনে তাঁদের খুব কাজে লাগানো হয় নি, কিন্তু তাঁরাই পাকিস্তানি সৈন্যদের উত্যক্ত করে মনোবলহীন করে তুলেছিল এবং এখন নিজেদের মর্যাদাবোধ কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হতে দেবে না তাঁরা।

❋❋❋

আমরা যশোরে প্রবেশ করি এবং সোজা চলে যাই মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে। এখানে যুদ্ধের কোনো চিহ্ন নেই। জোর লড়াই হয়েছে শহরের উত্তরে। নবম ডিভিশনের কম্যান্ডার, গোলগাল তাগড়াদেহী, মেজর জেনারেল দলবীর সিং আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি জানালেন যে, যশোরের পাকিস্তানি সৈন্যরা খুলনার পথ ধরে পশ্চাদপসরণ করছে। 'তাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। নতুবা আমরা তাদের শেষ করে দেব। জন্মগতভাবে আমি যদিও শান্ত প্রকৃতির।'

নয়াদিল্লিতে কর্মকর্তারা যেখানে বলেছে যে যশোর এড়িয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে ঐ বক্তব্যের সঙ্গে যশোর দখলের ব্যাপারটা তিনি মেলান কি করে—এমনি প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'স্বদেশের জন্য মিথ্যাচার করাটা কারো কারো নিয়তি।'

ভারতীয়রা যেখানটায় পশ্চাদগামী পাকিস্তানিদের আক্রমণ করছে, জেনারেলের অনুমতি নিয়ে আমরা সেই রাস্তা ধরে এগোই। পথের ধারে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে পাকিস্তানিদের বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্র, বিশৃঙ্খলভাবে পিছিয়ে যাওয়ার সময় ফেলে যাওয়া হয়েছে সব। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লেখা এক বালকের পত্রে তার সৈনিক পিতাকে বলা হয়েছে ইন্ডিয়াকে ক্র্যাশ করতে। কাছের মাঠে পড়ে আছে দুই বাঙালির লাশ—শরীরের মাংস বেশ কিছুটা কুকুরের ভোগে লেগেছে। গ্রামবাসীরা জানালো পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানিরা তাঁদের হত্যা করেছে। অনতিদূরে আরেক বাঙালির শব, বাঁ হাত কেটে বিচ্ছিন্ন করা এবং বুকের মাংস খুবলে নেওয়া।

ফেরার পথে আমরা দেখি আগুয়ান ভারতীয় সৈন্য বহরকে অভিনন্দিত করছে বাঙালি জনতা। উল্লাস জানিয়ে মুক্তিদাতাদের আলিঙ্গন করছে, বুকে টেনে নিচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে গেল উচ্ছ্বাসউদ্বেল মুক্তিযোদ্ধা–ভর্তি একটি বাস। তাঁদের কেউ কেউ ছাদের ওপরে নাচছে। প্রতিটি জানালা দিয়ে বের হয়ে আছে বন্দুকের নল। তাই বাসটিকে দেখাচ্ছে যেন চলন্ত পিনকুশন।

ডিসেম্বর ৯

ক্রমশই আরো বেশি করে প্রমাণ মিলছে যে পিছিয়ে আসার সময় পাকিস্তানিরা বাঙালিদের জবাই করছে এবং মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য বাঙালিও পাকিস্তানি ও তাদের বেসামরিক সহযোগীদের ওপর বদলা নিচ্ছে। পাইকারি হত্যাযজ্ঞ পরিহারের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী বাঙালিদের প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড বন্ধে কঠোর নির্দেশ জারি করেছে।

একজন আর্মি ক্যাপ্টেন জানালেন যে, তিনি পথের পাশে পাকিস্তানি সৈনিকদের বেশ কিছু ক্ষতবিক্ষত শবদেহ দেখতে পেয়েছেন। তাদের আঙুল কোপ দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা, বুকে ক্ষত ও গলা আড়াআড়িভাবে চেরা।

ডিসেম্বর ১৩

আরেকজন রিপোর্টার সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ–পরিস্থিতি দেখার জন্য আমি গাড়িতে খুলনার দিকে রওয়ানা হই। গুড়ুম গুড়ুম গোলাবর্ষণের শব্দ যত ঘনিয়ে এলো আমার চালক মিস্টার সিং ততই নার্ভাস হচ্ছিলেন। আমরা তখনো কয়েক মাইল দূরে, কিন্তু তার গাড়ির গতিবেগ প্রায় শূন্যে নেমে এলো। আমি তাকে বললাম, 'মিস্টার সিং, আপনি যদি চালাতে না চান, তাহলে দিন, আমি চালাব।'

'তবে আপনিই চালান, সাহিব,' আশ্বস্ত হয়ে হাসিমুখে নেমে যেতে যেতে সে বললো।

রাস্তার ধারে লেখা রয়েছে : ওয়েলকাম টু খুলনা। পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পদাতিক

বাহিনীর দীর্ঘ কলাম, বহন করে চলছে রান্নার পাতিল থেকে বাজুকা সবকিছু।

আমরা মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলছিলাম। গর্ত খুঁড়ে অবস্থান নেয়া এক সৈনিকের কাছে আমার সঙ্গী জানতে চাইলো পথে মাইন পোঁতা থাকার আশঙ্কা রয়েছে কিনা। হাসিমুখে সে জবাব দিলো, 'নো ব্লাডি মাইন্‌স্‌, স্যার।'

মাঝারি আকারের একটি ট্যাঙ্ক ঘর্ঘর করে এগিয়ে চলছে ফ্রন্টের দিকে। কম্যান্ডার আমাদের দেখে হাত নাড়লেন। এটা এক প্রীতি–যুদ্ধ। অন্তত ভারতীয়রা আনন্দময়, বন্ধুপরায়ণ ও আস্থায় টগবগে।

আহত ভারতীয়দের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলো একটি জিপ। পেছন দিকে শূন্যে ভাসছে মানুষের পা, যেন উল্টো করে ঢোকানো হয়েছে তাঁদের।

কঠিন হয়ে উঠেছে ভারতীয়দের অগ্রগতি। পাকিস্তানিরা ঘাঁটি গেড়ে বসে জোর লড়াই চালাচ্ছে। ব্রিগেড কম্যান্ডার সাধু সিং যখন কথা বলছিলেন, প্রায় ২০০ গজ দূরে বেশ কটি গোলা এসে বিস্ফোরিত হলো। পাকিস্তানি ভারি মেশিনগানের গুলিবর্ষণ পটভূমিকায় তারযন্ত্রের মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

ফেরার পথে দেখি গোলাগুলির এলাকা থেকে যেসব লোক পালিয়ে গিয়েছিল তাঁরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। বাঙালিরা কখনোই এক–দু মাইলের বেশি দূরে থাকে না। আর্মি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলে। ফিরে আসা লোকজনদের ভেতরে ভারতীয় শরণার্থী শিবির প্রত্যাগতরাও রয়েছে, কাঁধে বহন করছে যৎসামান্য সম্বলের দীনহীন বস্তা, তাঁদের দেখাচ্ছে অনিশ্চিত ও বিমূঢ়।

ডিসেম্বর ১৪

ভারতীয় আর্মি আমাকে–সহ ১১ জন সাংবাদিককে নির্বাচন করেছে ঢাকায় তাদের চূড়ান্ত আক্রমণে সেনাবাহিনীর সঙ্গী হতে।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি দরজাবিহীন ডিসি–৩ বিমানে আমরা আগরতলার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করি।

আমরা উড়ে যাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তানের বুকের ওপর দিয়ে। ১৯৪৭ সালে পারস্পরিক ঘৃণার মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের জন্মের পর, এই প্রথমবারের মতো কোনো ভারতীয় সামরিক বিমান এমনিভাবে উড়ছে। ভয়ের কিছু নেই বলে মনে হয়। কেননা পূর্বাঞ্চলে সকল পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত হয়েছে এবং কেবল ঢাকাতেই শুধু রয়ে গেছে কিছু বিমানবিধ্বংসী কামান, আর আমরা চলছি রাজধানীর অনেকটা উত্তর দিয়ে।

আগরতলায় অবতরণের সময় দেখি যুদ্ধের শুরুতে রানওয়েতে পাকিস্তানিদের সৃষ্ট ক্ষত ভরাট করার কাজ করছে কর্মীবাহিনী।

তিনটি জিপ ও একটি ট্রাকে করে আমরা তখুনি রওয়ানা হয়ে কসবা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করি। এখানকার ভবনে বড় বড় গর্ত তীব্র লড়াইয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হঠাৎ একটি জিপ গর্জন করে থেমে যায়। আরেকটির চাকা ফুটো হয়ে যায়। আমরা কোনোক্রমে যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫৭তম ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছই তখন সন্ধে

হয়ে গেছে। মেঘনা নদী দিয়ে যে স্টিমারে আমাদের নরসিংদী যাবার কথা, আধঘণ্টা আগে তা ছেড়ে গেছে।

ডিসেম্বর ১৫

আমাদের নৌযান ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়লো। ঠেলে নিয়ে চলেছে দু'টি ৫.৫ ইঞ্চি কামানবাহী পনটুন ভেলাকে। নদীতীরে ভারতীয় সৈন্যরা মজাদার অঙ্গভঙ্গি করে ছবির জন্য পোজ দিচ্ছে।

সড়কপথে এক অতি বিলম্বিত যাত্রা শেষে আমরা পৌছুলাম ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে, ঢাকা থেকে নয় মাইল দূরের ভুলতায়। রাতটা কাটালাম ভইলা নামের এক সমৃদ্ধ গ্রামে। এখানে ৩০০ লোকের বাস। মশককুলের আকার অতিকায়।

ডিসেম্বর ১৬

সকাল সোয়া পাঁচটার দিকে কামানের গোলাবর্ষণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। গুলির আওয়াজকে পটভূমিকার সুরধ্বনি করে গ্রামবাসীরা আমাদের খেদমত শুরু করে। নাশ্তা দেয়া হলো চীনামাটি ও কাচের বাসনপত্রে, নিশ্চয় মাটিতে পুঁতে রাখা কারো তোরঙ্গ থেকে এগুলো বের করা হয়েছে। উন্নতমানের এই নাশ্তায় ছিল ময়দার চ্যাপ্টা রুটি, গরুর মাংস, মুরগির ঝোল, সেদ্ধ ডিম আর চা। আমাদের খাওয়া দেখতে জড়ো হলো গ্রামের তাবৎ লোক।

চতুর্থ ব্যাটেলিয়ানের হেডকোয়ার্টারে আমাদের অভ্যর্থনা জানান কম্যান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিম্মত সিং। খড়ের গাদার ওপর বসে কোলে ম্যাপ বিছিয়ে তিনি প্রথমে আমাদের জন্য চায়ের হুকুম করলেন। তারপর যুদ্ধ-পরিকল্পনা সবিস্তারে জানালেন। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তিনি দাঁড়ি কামান নি এবং একে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কামাবেনও না।

৯-১২ মিনিটে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপারে পাকিস্তানি অবস্থান তাক করে কর্নেলের মাউন্টেন গানগুলো গর্জে উঠলো। আমরা হেঁটে এগিয়ে গেলাম পরিস্থিতি দেখার জন্য। গ্রামবাসীরাও দেখতে এগিয়ে এসেছে।

গ্রামবাসীদের উল্লাসধ্বনির মধ্যে ছয়টি কামানোর ব্যাটারি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গোলাবর্ষণ করলো। চা আর সেদ্ধ ডিম খাওয়ার জন্য আমরা গাছের ছায়ায় এসে বসি। আমাদের জন্য এ হচ্ছে নাশ্তাপানির সময়-সমেত যুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং ব্রিগেড এখন অবস্থান গুটিয়ে ঢাকার দিকে আনন্দমুখর বিজয়যাত্রা শুরু করেছে। উল্লসিত বাঙালিরাও মিছিল করে চলেছে তাঁদের নায়কদের পাশাপাশি। পথের কিছুটা আমি একটা ট্যাঙ্কের সওয়ারি হই।

ঢাকায় বিশৃঙ্খল আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর রাত্রিকে বিদীর্ণ করে তুললো পিস্তল-বন্দুকের গুলির শব্দ। দালালদের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিশোধ নিচ্ছে এবং দালালরাও পাল্টা গুলি করছে।

আমরা আমাদের চূড়ান্ত যাত্রা শুরু করলাম—প্রথমে হেলিকপ্টারে আগরতলায় এবং সেখান থেকে বিমান যোগে ফেরা। আমাদের পেছনে রাত্রির আঁধারে অন্য হেলিকপ্টারগুলোর পাখার বোঁ-বোঁ শব্দে সেগুলোকে দেখাচ্ছিল যেন অতিকায় জোনাকি-পোকা।

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি ভারতীয় বাঙালিরা বাংলাদেশের অভ্যুদয়-উৎসব পালন করছে ব্যান্ডসঙ্গীত বাদন ও বাজি পোড়ানোর মধ্য দিয়ে। নিষ্প্রদীপ বিধান তুলে নেওয়া হয়েছে। মিস্টার সিং এখন গাড়ি চালাতে পারবেন নিষ্কম্প হাতে।